সোনার বাংলা

নজার দেশ, এস্কিমো দ্বীপ, সোনার ভারত, দক্ষিণ আমেরিকায়

মাস কয়েক, উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রভৃতি

গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,

এফ. আর জি এস (লণ্ডন), এফ আর এস এ (লণ্ডন)

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্

৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নীরব-কর্ম্মী ও নিরাকাঙ্ক্ষী দেশ-সেবক

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল

গ্রন্থকার।

সোনার বাংলা

বাংলার রূপ

মায়ের কোল থেকে নেমে তোমরা মা-টির উপর খেলে বেড়াচ্ছ। মা ও মাটির মত আপন কেউ নেই। এমন যে মা ও মাটি তাঁদের কথা কার না শুনতে ইচ্ছা করে? তোমাদের মা-টির সব কথা তোমরা

বাংলা-দেশের পূর্ব্বকালের রাজাদের দরবার-গাড়ী

জান না। তোমাদের মা-টির নাম বাংলা। বাংলা-দেশ মস্ত বড় জায়গা। এর সব জায়গায় তোমরা যাওনি। হয় ত, যেতেও পারবে না। অথচ সব জায়গারই কথা জানা খুব উচিত। নিজের দেশের কথা ভাল করে না জানলে খাঁটি মানুষ হওয়া যায় না।

অনেক সময় হয় ত তোমরা ভাব, এত নাম থাক্‌তে তোমাদের দেশের নাম বাংলা দেশ হ'ল কেন? কেন হ'ল সকলের আগে তা'ই শুনে নাও।

অনেকদিন আগে—যখন হিন্দুদের এদেশ ছিল—বৌদ্ধ, মোসলমান বা খৃষ্টানেরা আসেননি, তখন চন্দ্রবংশ ব'লে এক হিন্দু-বংশের রাজারা এদেশ শাসন কর্‌তেন। তাঁ'দের একজন রাজার নাম ছিল বঙ্গ। নিজে খেটেখুটে তিনি এদেশের অনেক উন্নতি করেছিলেন। তাঁ'র রাজ্য ব'লে এদেশকে বঙ্গদেশ বলা হয়—সেই হ'তে আজ পর্য্যন্ত ঐ নাম চলে আস্‌ছে। কত রাজা রাজত্ব ক'রে মরে গেছেন, কত ধর্ম্মের লোক শাসন-কর্ত্তা হয়েছেন কিন্তু কেউ সেই হিন্দু রাজা বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বা দেশের নামের কোন পরিবর্ত্তন করেননি। তিনি এত ভাল রাজা ছিলেন যে তাঁ'র নাম লোপ করা কেউ সঙ্গত বোধ করেননি।

যাঁ'রা ভূগোল রচনা করেন, তাঁ'রা অনেকেই বাংলা-দেশের ছবি দেখে অনুমান করেন যে গঙ্গার "ব"-দ্বীপ হচ্ছে এই বাংলা-দেশ। গঙ্গার ব-দ্বীপ ব'লেই হয়ত এ দেশের নাম হয়েছে বাংলা। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণেও এসম্বন্ধে নানা মত আছে।

আদিম-অধিবাসী

তোমাদের জানা উচিত যে তোমাদের এই দেশে এখন তোমরা—যা'রা বাস কর্‌ছ,—তা'দেরই পূর্ব্ব-পুরুষেরা কি বাস কর্‌তেন অথবা অন্য কোন লোক থাক্‌তেন?

কথাটা বিশেষ ভাব্‌বার কথাই বটে। এখনও বনে বনে, নানা

জায়গায়, অসভ্যের মত অনেক লোক দেখা যায়। তা'রা হ'চ্ছে এদেশের আদিম-অধিবাসী। সর্ব্ব-প্রথম এখানে তা'রাই বাস করত। তোমরা কেউ কেউ হয়ত সাঁওতালদের দেখে থাক্‌বে আর তা'দের নাচ-গানও শুনে থাক্‌বে। এই সাঁওতালদের মত আছে ভীল, কোল ভুঁইয়া, গারো, গন্দ, হাড়ি, হাজং, হো, খরে, খাড়িয়া, কোচ, কোড়মগ, মাল, সৌরিয়া, মেচ, মুণ্ডা, ওরাওঁ, তুরি, টিপরা, কুকি, নাগা প্রভৃতি। ভারী সরল, বেজায় সোজা লোক তা'রা; কোন গোলমাল অথবা কুটিলতা তা'রা জানে না। আদিম-অধিবাসীরা এখন প্রায় না থাকারই মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিন দিন তা'দের সংখ্যা কমে আস্‌ছে। যা'রা আছে তা'রা বিদেশী লোকের নানা রকমের প্রলোভনে পড়ে স্ব-ধর্ম্ম ছাড়্‌ছে, বিভিন্ন ভাব ধর্‌ছে।

যুদ্ধের নাচ দেখাতে উদ্যত বাংলা-দেশের আদিম অধিবাসী নাগাগণ

বাংলা-দেশের সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা কত, তা' জান্‌তে হয়ত তোমাদের খুব কৌতুহল হ'চ্ছে। তোমরা বোধ হয় জান যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর গভর্ণমেণ্ট দেশের লোক সংখ্যা গণনা করান। তা'কে বলে আদম-সুমারি বা সেন্‌সাস্; শেষ লোক সংখ্যা গণনা হ'য়েছে ইং ১৯৩১ সালে। তখন সারা বাংলায় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ছিল ৫,০১,২২,৩৫০ জন। এখন নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। বঙ্কিচন্দ্র তাঁ'র আনন্দ মঠের বিখ্যাত গান "বন্দে মাতরমে" বঙ্গের লোকসংখ্যা বলেছিলেন "সাত কোটী"। তখনকার বাংলা ছিল বৃহত্তর বঙ্গ। উড়িষ্যা ও বিহার ছিল একত্রে।

বাংলার সীমা

তোমাদের বাংলা-দেশ হ'চ্ছে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। এর উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

শুন্‌লে ত বর্ত্তমান বাংলা-দেশের সীমা? মানচিত্রে এই দেশটী দেখ্‌লে তোমরা দেখ্‌তে পাবে যে উত্তরে যে বিরাট, বিশাল, সুদীর্ঘ হিমালর পর্ব্বত আছে, তা'রই পাদদেশ হ'তে বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আরম্ভ হ'য়েছে। বাংলা-দেশের আয়তন প্রায় ৮২৯৫৫ বর্গ-মাইল। উঁচু, নীচু হিসাবে এ দেশকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগ হ'চ্ছে পার্ব্বত্য-ভূমি; উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম বা চাটিগাঁর পাহাড় এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় ভাগ হ'চ্ছে উচ্চ-ভূমি; বর্দ্ধমানের উচ্চ-ভূমিগুলো এবং রাজসাহীর বারিন্দ অঞ্চল এই পর্য্যায় ধরা যেতে পারে। তৃতীয় ভাগ হ'চ্ছে সমতল

বাংলা-দেশ ও বিহারের নিকটবর্তী গঙ্গা-নদীর দৃশ্য

ভূমি, উত্তর বঙ্গ হ'তে ক্রমশঃ ভূমি নীচু হ'য়ে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড সমতল-ভূমি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

তোমরা ত জান যে তোমাদের এই বাংলা-দেশ সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। বল ত, কেন এত শস্য হয় তোমাদের দেশে ? একটু ভাব্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। ভাল শস্য হ'তে লাগে ভাল মাটি আর আবশ্যকমত প্রচুর জল। বাংলার উত্তরে হিমালয়ে হয় খুব বৃষ্টি। গঙ্গা আর তা'র শাখা—পদ্মা, ভাগীরথী, মধুমতী, আড়িয়ালখাঁ, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, করতোয়া, তিস্তা, আত্রেই, কংসাই, গোমতী, রূপনারায়ণ, দামোদর, সুবর্ণরেখা, কর্ণফুলি প্রভৃতি নদীর জলে বাংলা-দেশ হ'য়েছে সুজলা, কাজেই যথেষ্ট শস্য জন্মে। বাংলা-দেশের মাটি ভারী উর্ব্বরা প্রায় সব জায়গাতেই রয়েছে পলিমাটি। একটা গল্প বল্‌ছি শোন। গল্পটা হ'চ্ছে, বাংলা-দেশে এত পলিমাটি এল কি ক'রে তা'রই কথা।

অনেকদিন আগে বাংলা-দেশ ছিল জলে জলময় আর হিমালয় যুগ যুগান্তর ধরে উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে এর উত্তরে। হিমালয়ের ভারী অহঙ্কার। কেবলই উঁচু হ'চ্ছে। বায়ু বা পবন-দেব, যাঁ'কে তোমরা বল—বাতাস—তাঁ'র গায়ে বেজায় জোর। তিনি হিমালয়ের আস্পর্দ্ধা দেখে, মনে মনে ভাব্‌লেন—হিমালয়, তোমার বড্ড অহঙ্কার বেড়েছে, না ? অহঙ্কার দিচ্ছি ভেঙ্গে। কিন্তু হিমালয়ের যে রকমের শক্ত শরীর ! কি কর্‌বেন তিনি ? ফুর্‌ফুরে বাতাস ; তা'হলে কি হয় ? বাতাস হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা মার্‌তে সুরু কর্‌লেন। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে, ক্রমে অত যে শক্ত হিমালয় তা'কে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে, নদীর জল দিয়ে সমুদ্রে নিয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। নদীগুলোর ভারী কষ্ট

হ'ল—সবারই বুকে সে কি বোঝা! মাঝে মাঝে, সইতে না পেরে, নদীরা রেগে নিজেদের পাড় নিজেরা ভেঙ্গে পাগলীর মত কাণ্ড-কারখানা কর্‌তে লাগ্‌ল; এতে কিন্তু একটা মস্ত বড় কাজ হ'য়ে উঠ্‌ল। হিমালয়-ভাঙ্গা মাটিগুলো ভারী ভাল। ওদের বলে পলিমাটি; সেই মাটি আন্‌বার ফলে বাংলা-দেশের জল শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল আর অনেক জায়গা ভরে উঠে, স্থল হ'য়ে গেল! সেই স্থলে, সেই সুন্দর মাটিতে ফল্‌তে থাক্‌ল যত সব সুন্দর সুন্দর শস্য, ফুল-ফল, গাছ-পালা, লতা-পাতা। বৃষ্টি হ'য়ে, নদীর জল উঠে, বাংলা-দেশ বিচিত্র এক উর্ব্বর দেশ হ'য়ে দাঁড়াল। অতি সহজে, খুব কম পরিশ্রমে, এখানে হ'তে লাগ্‌ল ভারে ভারে শস্য। কৃষকেরা তা'দের ছোট্ট ফাল দিয়ে, খুর্‌-খুর্‌ ক'রে এক আধটু হাল চালাতেই তা'দের গোলা, মরাই পূর্ণ হ'তে থাক্‌ল।

বাংলার শস্য

বাংলা-দেশের প্রধান শস্য হ'চ্ছে ধান আর পাট। বাঙ্গালীরা যে ভাত খেতে বেশী ভালবাসে তা'ত তোমরা জান। এইজন্য অনেক ধানের দরকার। অধিকাংশ লোকে, বেশীর ভাগ জায়গায় বোনে ধান, তারপর পাট। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত পাট জন্মে না। মুগ, মসূর, ছোলা, খেসারী, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, সরিষা, খেজুর, তামাক, তুলা, চা, আলু প্রভৃতিতে বাংলা-দেশ পরিপূর্ণ। কৃষিজ অজস্র শস্য, ফল-মূল ছাড়া বাংলার পশ্চিমে প্রচুর খনিজ-দ্রব্য জন্মে। আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লা এবং বরাকরের লোহা সত্য-সত্যই বাংলার দামী সম্পদ। মাঠে-মাঠে, গ্রামে-গ্রামে, সহরে-সহরে অজস্র শস্য—অফুরন্ত খাদ্য।

এত শস্য, এত খাদ্য-জিনিষ, এত সুন্দর সুন্দর ফল-ফুল, নানা কাজের গাছ-পালা, লতা-পাতা একই দেশে ও একত্রে বাংলা-দেশ ছাড়া আর কোথাও বড় দেখা যায় না। কোন দেশের লোক এত সুলভে, এত সহজে ও এমনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে পারে না ব'লে আমাদের দেশকে কবিরা বলেন, **"সোনার বাংলা।"** এই সোনার বাংলাকে উদ্দেশ্য ক'রেই কবি গেয়েছেন—

> "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
> চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী !"

বিভক্ত-বাংলা

কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য বাংলা-দেশকে চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া হ'য়েছে। তা'দের নাম দেওয়া হ'য়েছে—পূর্ব্ব-বঙ্গ, পশ্চিম-বঙ্গ, উত্তর-বঙ্গ ও মধ্য-বঙ্গ। এই চারি বঙ্গে আটাশটী জেলা আছে। এই জেলা কয়টীতে পাঁচ কোটীর কিছু উপর লোকের বাস। তা'রা সকলে একই প্রকৃতি-সম্পন্ন এবং প্রায়ই এক ভাষা-ভাষী। পৃথিবীর কোথায়ও এমনটী বড় দেখা যায় না। বাংলা-দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও প্রায় এক রকম।

একটা মজার কথা শুনে তোমরা নিশ্চয় হাস্‌বে। আচ্ছা, বল ত তোমাদের এক এক জনের গায়ের রং এক এক রকম কেন ? কোন দেশে ত এমন দেখা যায় না। সাহেব-মেমদের দেখেছ ত, তাঁ'রা একেবারে শাদা। নিগ্রোরা একেবারে আবলুস্‌ কাঠের মত কালো। আমেরিকার রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের রং তামার মত লাল।

আরবদেশের লোক সব এক রংয়ের। ইহুদীরা সব একরঙ্গা, কিন্তু তোমাদের এক এক জনের এক এক প্রকার রং—কেউবা ফর্সা, কেউবা কালো, কেউবা শ্যাম-বর্ণ আর কেউবা তামাটে রংয়ের।

বাংলা-দেশের পল্লীগ্রাম

এ সব হচ্ছে আমাদের—বাঙ্গালীদের—ভারতবাসীদের একটা বিশেষত্ব; অন্য কোন দেশে এমনটি আছে ব'লে শোনা যায় না। আমাদের—বাঙ্গালীদের—মত নানা ধরণের পোষাক অন্য কোন

দেশের লোক পরে না। তা'রা প্রায়ই এক রকম পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে।

বাংলা-দেশের লোকদের যে কত রকমের ধর্ম্মমত তা'র ঠিক-ঠিকানা নেই। কথা বলার ভাষার ভঙ্গী গ্রামে গ্রামেই প্রায় কিছু না কিছু পৃথক—তা'ছাড়া, এক জেলার লোকের সঙ্গে অন্য জেলার লোকের ভাষার ত কথাই নাই—সকলেই বাংলা বলে কিন্তু কী বিচিত্র পার্থক্য!

"নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি।
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্র কানন, রাখালের খেলা গেহ।
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে।
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌ চোখে আসে জল ভরে।"

বাংলা-দেশের বিভাগ

তোমাদের এই বাংলা-দেশের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। ঐ-গুলোর নাম কি জান? সে-গুলো হচ্ছে (১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ, (২) ঢাকা বিভাগ, (৩) রাজসাহী বিভাগ, (৪) চট্টগ্রাম বিভাগ, (৫) বর্দ্ধমান বিভাগ। এই পাঁচ বিভাগের আটাশটী জেলায় ৮৯৫২৫ খানি গ্রাম আছে। গ্রামের লোকদের অনেকের ঘর খড়ের, টিনের ও খোলার। ইটের দালান খুব কম বাড়ীতেই আছে।

বাংলার ভাষা

বাংলা-দেশের লোকেরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন এবং সেই বাংলার উচ্চারণ-ভঙ্গী এত বিচিত্র যে এক অঞ্চলের বাঙ্গালীর কথা অন্য অঞ্চলের বাঙ্গালী অনেক সময় বুঝ্‌তে পারে না। পশ্চিম-বঙ্গ, বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলের লোকের ভাষার মধ্যে বিহার প্রদেশের ব্যবহৃত ভাষার অনেক শব্দ শোনা যায়। চট্টগ্রামের লোকের ভাষায় শোনা যায় অনেক আরবী শব্দ। পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের কথার কতই না তারতম্য দেখা যায়! চট্টগ্রামের কথা প্রায়ই বোঝা যায় না। ত্রিপুরা, ঢাকা ও বরিশালের কথা শুনে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার লোক অনেক সময় হাসেন। ময়মনসিংহ সদরের কথা শুনে সেই জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার লোক সব বুঝ্‌তে পারেন না। আবার কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা পৃথক। ভাষার এই বৈচিত্রও আলোচনার যোগ্য।

বাংলার মানুষ

বাংলার কয়েকটী স্থানের লোকের কথা শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুসী হ'বে। (১) প্রথমেই বল্‌ছি, পাহাড়ে লোকদের কথা। পাহাড়ে যা'রা বাস করে আমরা তা'দের সাধারণ কথায় পাহাড়িয়া বলি।

বাংলা-দেশে অনেক পাহাড়-পর্ব্বত আছে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে এখনও বনে, জঙ্গলে ও পাহড়ে বাস করে। তোমাদের দেশের উত্তরে পর্ব্বতময় ভুটানে ও তা'র নীচে অনেক ভুটিয়া বাস করে। এদের রং ফর্সা, নাক চ্যাপ্‌টা এবং গায়ে খুব বল। এদের পুরুষদের দাড়ি বা গোঁফ হয় না এবং সাধারণতঃ এরা কোট বা পা-

জামা পরে। বাংলা-দেশের শেষ সীমায় এরা থাকে, কাযেই সব সময় তোমরা এদের দেখ্‌তে পাওনা। এদের স্ত্রীলোকেরা ঘাগ্‌রা বা মোটা শাড়ী এবং জামা পরে। বাঁশ ও পাতার তৈরী এক প্রকার টুপী মাথায় দেয় এবং বন্য জন্তুর ভয়ে সর্ব্বদা একখানি ধারাল 'ভোজালি' সঙ্গে রাখে। এদের মেয়েরা কখনও ঘোমটা দেয় না। পুরুষেরা করে কি জান? পুরুষেরা মেয়েদের মত অনেক সময় লম্বা বেণী বাঁধে এবং তা'তে তা'দের কেমন অদ্ভুত দেখায় তা' তোমরা একবার দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। ভূটিয়ারা ভূত বিশ্বাস করে এবং ভূতের হাত হ'তে ছেলেমেয়েদের রক্ষা কর্‌বার জন্য তা'দের গলায় চিতা বাঘের দাঁত পরিয়ে দেয়। ভুটিয়া ও ভুটানী উভয়ে সমানভাবে পরিশ্রম করে। পিঠে ভারী ভারী মাল নিয়ে এবং ঐ মালগুলির সঙ্গে বাঁধা দড়ির অপর অংশ নিজেদের কপালে বেঁধে এরা অনায়াসে পাহাড়ের এক জায়গা হ'তে অন্য জায়গায় চলে যায়।

বাংলা-দেশের পার্ব্বত্য বালিকা কুকিগণ

বল ত ওরা কি খায় ? ওরা তোমাদের মতই ভাত, ডাল ও বনের ফল-মূল, মাংস ও চা খায়। সারাদিন এরা পাহাড়ে পাহাড়ে খুব খাটে এবং সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে গিয়ে নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ করে। এরা প্রায়ই স্নান করে না এবং এজন্য ওদের গায়ে অতিশয় দুর্গন্ধ। ওদের গায়ে এত ময়লা জন্মায় যে সময় সময় উকুনের মত পোকা দেখা দেয়। ভুটিয়া ছেলেমেয়েরা বেশ আনন্দপ্রিয় এবং ভীষণ স্ফূর্ত্তিবাজ।

এবার (২) **বন-জঙ্গলের লোকদের** কথা বল্‌ছি। বাংলা-দেশে অনেকগুলি জঙ্গলি জাত আছে কিন্তু আমরা আরম্ভ করছি সাঁওতালদের

সাঁওতালগণ তীর ছুঁড়্‌ছে

বিষয়। তোমরা সাঁওতাল পরগণার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। বাংলা-দেশের অন্তর্গত বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেও এদের দলে দলে দেখ্‌তে পাবে। জঙ্গলে বাস করলেও এদের মন ভারী সাদা-

সিধে। এরা খুব পরিশ্রমী এবং এদের গায়ের রং খুব কালো। সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়েরা ফুল ভালবাসে এবং ফুল দিয়ে সাজে। শরীরে খুব বল এবং স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় এদের রেলের রাস্তার কিম্বা অন্যান্য কঠিন কায কর্‌বার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ওরা ভাত, বন্য জীব-জন্তুর মাংস, সাপ, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, গিরগিটী, ডানাশূন্য বোল্‌তা ও ভীমরুলের বাচ্ছা, যজ্ঞ-ডুমুরের পোকা প্রভৃতি খায়। এমন কি, পাহাড়ে জায়গার 'মটকুড়' ব'লে সোঁদা-মাটীর ছোট ছোট ঢেলাও খেতে এরা বাদ দেয় না। মাদল ও বাঁশী বাজিয়ে সাঁওতালরা নানা ভঙ্গীতে নাচে ও স্ফূর্ত্তি করে। তীর-ধনু নিয়ে এরা শিকার করে এবং এদের প্রায়ই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। ওরা খুব সাহসী ব'লে বাঘ, ভাল্লুক, বন্য-বরাহ প্রভৃতিকে মোটেই ভয় করে না। এক এক দলে এক এক জন মোড়ল থাকে, তা'র কথা সকলে শোনে। ভূত-প্রেতে এদের খুব ভয় ও বিশ্বাস। ভূতের উদ্দেশ্যে মোরগ ও শূকর এরা বলি দেয়। অসভ্য ও অপরিষ্কার ব'লে সাঁওতালরা প্রসিদ্ধ। একবার একখানা কাপড় পর্‌লে সেখানা না ছিঁড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তা'রা বদল করে না। এখন এদের দু'চার জন কিছু কিছু লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করেছে।

সাঁওতালদের মোরগের লড়াই একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ। তোমাদের সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন ধারণাই নেই। দু'জন সাঁওতাল, দু'টো মোরগ এনে সাম্‌না-সাম্‌নি ছেড়ে দেয় এবং তা'দের এমন উত্তেজিত করে যে মোরগ দু'টো রেগে একেবারে যেন পাগলের মত হ'য়ে যায়। তা'রপর লেগে যায় তা'দের ঝগড়া, যুদ্ধ এবং মারামারি। রক্তারক্তি ও একটা পরাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মোরগগুলো লড়াই কর্‌তে থাকে। সহরে যেমন ফুটবল খেলা দেখ্‌তে লোকের ভীড়

হয় তেমনই এই সাঁওতালী মোরগের লড়াই দেখ্‌বার জন্য শত শত সাঁওতাল একত্র হয়।

পাহাড় ও বন-জঙ্গলের লোকদের কথা শুন্‌লে। এবার (৩) **সমুদ্রের ধারের লোকদের** কথা বল্‌ছি। তোমরা বোধ হয় জান, তোমাদের দেশের তিন দিকে স্থল আর কেবল দক্ষিণ দিকে জল। এই প্রকাণ্ড জলরাশির নাম বঙ্গোপসাগর। তোমাদের মধ্যে অনেকেই নদী, খাল, বিল ছাড়া বোধ হয় সমুদ্র দেখ্‌বার সুযোগ পাওনি। যদি কোন রকমে একবার সে সুযোগ হয় তা'হলে দেখ্‌তে পাবে সেখানে কত জল আর সে জলের উপর দিয়ে কেমন শত শত ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। ঢেউগুলো এসে স্থলে—তীরে আঘাত কর্‌ছে। এই স্থলভাগকে বলে উপকূল। তোমাদের দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক এই উপকূল-ভাগের অন্তর্গত।

বল ত, তোমাদের দেশের দক্ষিণ উপকূলকে কি বলে? সুন্দর-বনের নাম শুনেছ? এ সেই সুন্দর-বন। সুন্দর-বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেখানে কত বড় বড় সব সুন্দরী গাছ! আরও কত রকমের গাছ জঙ্গলটাকে অন্ধকার ক'রে রেখেছে। আজকাল স্থানে স্থানে আবাদ হ'লেও এখনও যা' জঙ্গল রয়েছে তা' দেখ্‌লে ভয় হয়।

সমুদ্রের বড় বড় শাখা সুন্দর-বনের স্থানে স্থানে ঢুকে পড়েছে। এই বনে বড় বড় ও ভয়ঙ্কর 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা বাংলার নিজস্ব বাঘ প্রায় সব সময়েই ঘুরে বেড়ায়। স্থানে স্থানে মারাত্মক বড় বড় সাপ, কুমীর প্রভৃতিও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারে এবং এখানকার সমস্ত জায়গায় যে লোকেরা বাস করে তা'দের অধিকাংশই হ'চ্ছে **জেলে**! তা'রা সমুদ্রের নানা জাতীয়

মাছ ধ'রে কল্‌কাতা এবং অন্যান্য সহরে চালান দিয়ে বেশ ছ'পয়সা রোজগার করে। দিনরাত বাঘ, কুমীর, হাঙ্গর প্রভৃতির সঙ্গে লড়ে লড়ে এখানে থাক্‌তে হয় ব'লে এই লোকগুলো বেজায় সাহসী। ওরা কুমীরের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে আসে মাছ—ডিঙ্গি, নৌকা নিয়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রের দূরে—অতি দূরে।

চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের লোকেরাও খুব সাহসী। সমুদ্র, ঢেউ, কুমীর বা জলের বড় বড় জন্তু-জানোয়ার দেখে এতটুকুও এরা ভয় করে না। ওদের মাছ ধর্‌বার ভারী সখ এবং এ বিষয়ে ওরা খুব পটু। এদের ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট নৌকায় চড়ে, তালগাছের মত উঁচু উঁচু ঢেউ ভেদ ক'রে ছুটে যায়। তোমরা গঙ্গার উপরে ষ্টীমার, লঞ্চ এবং জাহাজে যে খালাসীদের দেখ্‌তে পাও তা'দের অনেকেরই বাড়ী এই চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে।

গাছপালা

বাংলা-দেশে গাছ-পালার নেই অন্ত। গ্রামে-গ্রামে, পাহাড়ে-পাহাড়ে অজস্র, অফুরন্ত গাছ। ঐ গাছের কতকগুলো দিয়ে করা হয় ঔষধ, কতকগুলোয় জ্বালানী কাঠ আর কতকগুলোয় খুঁটি। কত কাজেই যে কাঠের দরকার হয় তা'র ঠিক ঠিকানা নেই। গোটা কয়েক ঔষধের গাছের কথা বল্‌ছি—তুলসী, নিম, অনন্তমূল, কণ্টিকারি, আকন্দ, চাল্‌তে, মাদার, বাসক, গুলঞ্চ, অশোক, অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, কালমেঘ, কুক্‌সিমা, কাঁটানটে, ওলট-কম্বল, ভাঁট, সোঁদাল ঘৃতকুমারী, সোমরাজ, জাম, কলা, বেল, বাবলা, পুনর্নবা, শিমূল, শতমূলী, ব্রাহ্মী, পাথরকুচি, চিতা, আপাং, অর্জ্জুন, হরিতকী, আমলকী,

বহেড়া, কালকাসুন্দা, বকুল, নারিকেল, তাল প্রভৃতি। এই গাছগুলো সব মাটি ভেদ ক'রে উঠে ব'লে এগুলোকে বলে উদ্ভিদ্।

তক্তা করবার জন্য যে গাছ ব্যবহার হয় এবার তা'র কতকগুলোর নাম বল্‌ছি—শাল, দেবদারু, সুন্দরী, পাইমা, জারুল, কড়ি, কাঁঠাল, আম, সেগুন, মেহগনী প্রভৃতি।

বাংলা-দেশের যেখানে সেখানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, ডালিম, কলা, খেজুর প্রভৃতি অজস্র ফলের গাছ দেখা যায়। এখানে এত গাছ পালা জন্মায় ব'লে তোমরা হয়ত মনে করতে পার যে পৃথিবীব সকল জায়গায়ই বুঝি এমনই অসংখ্য গাছ জন্মে থাকে আর এত ফল ফলে। আসলে কিন্তু তা নয়! এমন কি তোমাদের রাজার দেশ যে বিলাত সেখানেও নয়। বিলাতে কাচের ঘর ক'রে—আগুনের কুণ্ড জ্বেলে—তাপের বন্দোবস্ত ক'বে—অতি যত্নে কলম থেকে দু'চারটা আম ফলান হয়। ওখানে আমের কত আদর সে সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প বল্‌ছি।

(১) **আম গাছ**

একবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান মহাপুরুষ কেশব সেন। মহারাণী তাঁ'কে খুব আদর ক'রে কয়েকটা আমের মুকুল দিয়ে বলেছিলেন, "আপনার যশে ভারত গৌরবান্বিত; আমার আদর-স্বরূপ আপনাকে অতি যত্নের এই আমের মুকুল উপহার দিচ্ছি। [illegible] [illegible]তবর্ষে এর বিশেষ মূল্য নেই কিন্তু এখানে এ দুর্লভ। আমি [illegible] ব্যয়ে ও বহু [illegible] নিজের [illegible]গানে এই মুকুল উৎপন্ন করিয়েছি। এর গন্ধ আঘ্রাণ ক'রে আমি বড়ই পুলকিত হই, ঐ সময় মনে হয় মণিমাণিক্যের মূল্যও [illegible] কাছে অতি তুচ্ছ।"

আমরা 'রামায়ণে' দেখ্‌তে পাই যে আমকে 'অমৃত ফল' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবিকই আমের মত ফল পৃথিবীতে বুঝি আর নাই। কবি মনোমোহন বসু যথার্থই বলেছেন—

অমৃত স্বর্গেতে থাকে লোকে এই বলে,
কিন্তু ভাই আমাদের আম গাছে ফলে।

এমন জিনিষ আমাদের দেশে ঈশ্বর অজস্র দান করেছেন—সুলভ ক'রে রেখেছেন।

(২) বট গাছ

এত বড় গাছ বাংলা দেশে আর নেই বল্‌লেই চলে। ছোট্ট

বাংলা-দেশের হাও... ...দিয়ে ঘেরা নদীর পাড়ে স্নানের ...ছ

একটুখানি বীজ—তা'র গাছ ... ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়।

সিংহ যেমন নানা কারণে পশুদের রাজা, বটগাছও তেমনই নানাগুণে গাছেদের রাজা। এক একটা বটগাছ দু'তিন শ' বছর বেঁচে থাকে। বাংলা-দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বটগাছ হ'চ্ছে, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেরটী।

(৩) নারিকেল গাছ

এবার বলছি বাংলা-দেশের একটা ফলের গাছের কথা—গাছটির নাম হ'চ্ছে নারিকেল। তোমরা নিশ্চয়ই নারিকেল ফল খেয়েছ এবং সেটা চোখেও দেখেছ। সব জায়গায় এ গাছ হয় না। নোনা মাটিতে নারিকেল গাছ জন্মায় বেশী। সমুদ্রের ধারে এইজন্য ঐ গাছ বেশী দেখা যায়। এক একটা গাছের কাণ্ডের উচ্চতা প্রায় ৫০ ফিট্ এবং বেড় প্রায় তিন ফিট্ হয়। কাণ্ডটী সোজা ভাবেই উঁচুতে উঠে।

নারিকেল হ'তে আমাদের অনেক উপকার হয়। হাল্কা ডিঙ্গি-নৌকা তৈয়ার কর্তে এর কাণ্ড অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামে নারিকেল গাছ কেটে অনেকে পুকুরের সিঁড়িরূপে ব্যবহার করে কারণ এর কাঠ সহজে নষ্ট হয় না বা এতে ঘুণ ধরে না। নারিকেল গাছের পাতা হ'তে ঝাঁটা, ছোবড়া হ'তে গদি ও দড়ি, খোলা হ'তে হুঁকো এবং শাঁস হ'তে তেল হয়। নারিকেল অতি পুষ্টিকর এবং খেতে সুস্বাদ। বহু ঔষধে নারিকেল ব্যবহৃত হয়।

(৪) বাঁশ

এইবার বল্ব আর একটা দরকারী গাছের কথা। গাছটীর নাম বাঁশ। সচরাচর ৫০ হ'তে ৬০ ফিট্ পর্য্যন্ত এগুলো উঁচু হয়।

এদের ভেতরটা ফাঁপা, বাইরে থাকে অনেক গাঁইট। পাতাগুলো হয় লম্বা লম্বা।

বাঁশ ভারী কাযের জিনিষ। বাংলা-দেশে কিছু দিন আগে—করোগেটেড্ টিন আস্‌বার পূর্ব্বে—অধিকাংশ বাড়ীতেই 'ছনের' ঘর ছিল। এই ছনের ঘরের জন্য বাঁশ একটী অপরিহার্য্য বস্তু ব'লে গণ্য হ'তো। বাঁশের খুঁটি কম ব্যবহৃত হয় না। বাঁশ দিয়ে ভেলা, নদী বা

কুকিদেব তৈয়ারী বাঁশের পুল

খালের উপর সাঁকো, চুপ্‌ড়ী, চ্যাটাই, মাদুর, চিক্, মাছ ধর্‌বার পল—জালি—খালুই, মোড়া, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি তৈয়ার হয়। কাগজ তৈয়ার হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশ রপ্তানী ক'রে বাংলা-দেশের অনেক টাকা রোজগার হয়।

(৫) কার্পাস গাছ

বাংলা-দেশে কার্পাস বা কাপাস গাছের মত এমন উপকারী গাছ আর নাই। এই গাছ থেকেই হয় তূলা। তূলা বা তূলো তোমরা

সকলে বোধ হয় দেখে থাক্‌বে,—অন্ততঃ বালিশের তূলো ত দেখেছ-ই। কার্পাস ও শিমূল এই দুই রকমের তূলোই বালিশের জন্য ব্যবহৃত হয়। তূলো সব চেয়ে বেশী লাগে জামা-কাপড়ের সূতো কর্‌তে। ধানের মত এক সময় এ দেশে তূলোর চাষ হ'ত।

অত্যন্ত যত্ন ক'রে তূলোর চাষ কর্‌তে হয়। বাংলা-দেশের অন্ন-বস্ত্রের মধ্যে বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য তূলা একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

বাংলার জীব-জন্তু

বাংলা-দেশে জীব-জন্তু অজস্র ও নানা রকমের দেখা যায়। এখানকার বাঘ, গণ্ডার, হস্তী, ভল্লুক, বন্য-মহিষ, বন্য-শূকর, হনুমান, বানর, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং নানা রকমের সাপ ও মাছ প্রসিদ্ধ।

(১) বাঘ

তোমাদের দেশের গৃহপালিত জন্তুদের প্রায়ই দেখতে পাও ব'লে তা'দের সম্বন্ধে অনেক তথ্য তোমরা জান, সুতরাং ওদের কথা না ব'লে এদেশের কয়েকটী নাম-জাদা বন্য জন্তুদের বিষয় বল্‌ছি। বাংলা-দেশের বনে ও পাহাড়ে সাধারণতঃ তিন রকম বাঘ দেখা যায়। এক রকম কালো রংয়ের বাঘ আছে; সেগুলো তিন-চার হাত দীর্ঘ হয়। আর এক রকমের বাঘ আছে সেগুলো দীর্ঘে পাঁচ-ছয় হাত হয়—সর্ব্ব শরীর পীতবর্ণ ও লোমে আবৃত এবং তা'তে কালো কালো গুল আছে। এগুলোকে বলে চিতাবাঘ! আর এক

জাতের বাঘ আছে, তা'রা আরও বড় হয়। শরীরের হলুদ রংয়ের মধ্যে তা'র উপর কালো কালো লম্বা ডোরা-টানা। এগুলো
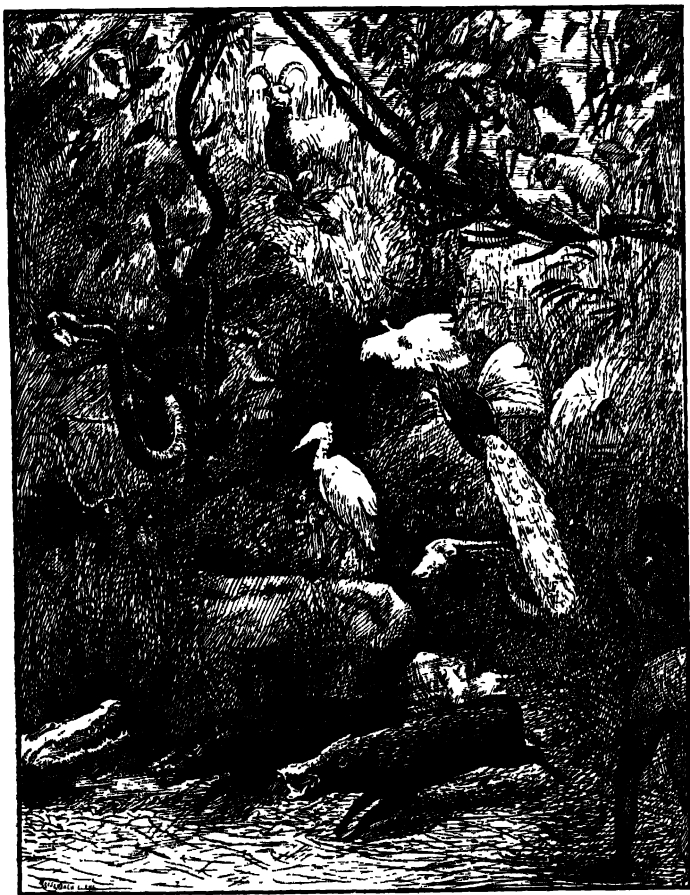
বাংলা-দেশের কয়েকটী পাখী ও জীব-জন্তু

উঁচু হয় যেন এক একটা বলদের মত। এদের গায়ে খুব জোর

এবং বড় বড় গরু বা মোষকে অনায়াসেই পিঠে তুলে নিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। এরাই হ'চ্ছে বাংলার নিজস্ব ও ভীষণ প্রাণী "রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

সাধারণতঃ বাঘেরা বিশ বৎসর বাঁচে। এক একবারে বাঘিনী ৩টা হ'তে ৫টা বাচ্ছা প্রসব করে। জন্তুদের মধ্যে এত হিংস্র জন্তু আর নাই, কিন্তু এরকম হয়েও বাঘিনীরা তা'দের বাচ্ছাদের বড্ড ভালবাসে। একদল সৈনিক একদিন যাচ্ছিল এক বনের মাঝখান দিয়ে, হঠাৎ তা'রা দেখ্‌লে দু'টো বাঘের বাচ্ছা শুয়ে আছে। তা'রা ঐ বাচ্ছা দু'টোকে ধরে নিয়ে গেল, তা'দের ক্যাম্পে। বাঘিনী গিয়েছিল খাদ্য সংগ্রহ করতে। সে ফিরে এসে বাচ্ছাদের দেখ্‌তে না পেয়ে আর মানুষের জুতোর দাগ দেখে, সেই চিহ্ন ধ'রে বরাবর গিয়ে উপস্থিত হ'ল সেই ক্যাম্পে। তখন তা'র না আছে প্রাণের মায়া, না আছে বন্দুকের ভয়। গর্জ্জে, উৎপাত ক'রে সে সৈনিকদের অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌লে। অবশেষে সৈনিকরা নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে তা'র বাচ্ছা দু'টোকে তা'র সঙ্গে যেতে ছেড়ে দিলে।

বাঘেরা ডাঙ্গার জানোয়ার হ'লেও সাঁতার কাট্‌তে পারে। অনেক সময় ওরা বন থেকে বেরিয়ে, জল সাঁত্‌রে নৌকারোহীদের আক্রমণ করে। সদ্য টাট্‌কা রক্ত ও পচা মাংস বাঘদের প্রিয়-খাদ্য। জীব-জন্তুর রক্ত তা'রা আগে খায় এবং দেহটা ফেলে রেখে দেয়; সেটা পচে উঠ্‌লে তারপর খায়।

বাঘ দেখে ঘোড়া ভয় পায় কিন্তু হাতী মোটেই ভয় করে না। এইজন্য এদেশের শিকারীরা হাতীতে চড়ে বাঘ শিকার করে। হাতী বাংলা-দেশের একটী বিশিষ্ট সম্পদ। যেখানে বাঘ থাকে, সেই

জায়গা কতকগুলো হাতী দিয়ে ঘিরে ফেলে শিকারীরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হ'তে থাকে। বাঘ গর্জ্জে সাম্‌নে আসে। তখন শিকারীরা হাতীর পিঠ থেকে গুলি করে। হাতীরা বাঘের আগমন বুঝে চীৎকার কর্‌তে থাকে। বাঘ এসে হাতীকে আক্রমণ ক'রে নখ দিয়ে আঁচ্‌ড়াতে ও দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়াতে থাকে। তখন বাঘ ও হাতীতে লড়াই বেধে যায়। হাতীর পক্ষে যখন বাঘের কামড় অসহ্য হয় তখন সে শুয়ে পড়ে— বাঘকে একবার নীচে ফেল্‌তে পারলে পিষেই মেরে ফেলে।

বাঘ না থাক্‌লে বনের অন্যান্য তৃণভোজী জন্তুরা ধান, শস্য প্রভৃতি খেয়ে উজাড় করত। বাঘের চর্ব্বি বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বাঘের চামড়ায় আসন হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ঐ আসনে ব'সে ধ্যান করেন—ওঁরা বলেন যে ভারী গুণ আছে বাঘের ছালে। বাঘের ছাল পরেন ব'লে স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেবের এক নাম হয়েছে কৃত্তিবাস। বাঘের নখ গলায় বেঁধে দিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অপদেবতার ভয় দূর হয় ব'লে অনেকের বিশ্বাস। এখন বুঝ্‌লে ত কত উপকার হয় বাঘ হ'তে।

(২) গণ্ডার

বাংলা-দেশের আর একটা অদ্ভুত জন্তুর কথা বল্‌ছি। তা'র নাম হ'চ্ছে গণ্ডার। গণ্ডার দেখ্‌তে হাতীর চেয়ে ছোট হলেও বল ও বিক্রমে কম নয়। এগুলো হিংস্র জন্তু নয়, অথচ ভাল পোষও মানে না—ভারী রাগী। একটা গল্প বল্‌ছি শোন—

অনেকদিন আগে একজন লোক জাহাজে ক'রে একটা গণ্ডারকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি কারণে, গণ্ডারটী রেগে গেল। তখন সে

আর যায় কোথা বা করেই বা কি? জাহাজখানা ভেঙ্গে ফেলে নিজে জলে ডুবে মর্‌ল আর সকলকেও মার্‌লে। এত রাগ কি ভাল?

গণ্ডার কাদায় পড়ে খেল্‌তে বড্ড ভালবাসে। আসামের নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশের সীমানায় কাদাওয়ালা বনভূমিতে মধ্যে মধ্যে গণ্ডার দেখা যায়, তবে বর্ত্তমানে এদের বংশ প্রায় লোপ পাবারই মত হয়েছে। যেখানে মানুষ খুব কম যায়, এমন জলা, বিল ও নদীর পাড়ে পাড়ে ওরা থাকে। সম্প্রতি বঙ্গদেশ ও আসামের সীমানা হ'তে ধৃত একটী গণ্ডারকে প্রায় ৪০০০৲ টাকায় একজন আমেরিকান্‌কে বিক্রী করা হয়েছে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সুন্দর-বনের জলাভূমির কাদায় এখনও মধ্যে মধ্যে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় ব'লে শোনা যায়।

গণ্ডারের গায়ের চাম্‌ড়া ভারী শক্ত—বাঘের নখ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয় না বা তরোয়ালের আঘাতে কাটে না, এমন কি, বন্দুকের গুলিও ভেদ ক'রে যেতে পারে না। পূর্ব্বে বাংলা-দেশে গণ্ডারের চাম্‌ড়া দিয়ে হ'ত ঢাল। ঐ ঢাল নিয়ে যোদ্ধারা লড়্‌তেন। গণ্ডারের ওষ্ঠ অধরের উপর ঝুলে থাকে। ঐ ওষ্ঠ দিয়ে ওরা খাবার দ্রব্য মুখে তুলে নেয় এবং ইচ্ছামত ওষ্ঠ বাড়াতে ও এদিক সেদিক ফেরাতে পারে। গণ্ডারী অনেক বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করে। জন্মাবার প্রথম মাসে সন্তানকে দেখ্‌তে হয় ঠিক শূকরের মত। তখন শিং থাকে না কিন্তু পরে নাকের উপর সেটা গজিয়ে উঠে। গণ্ডার ভিন্ন এমন নাকের উপর শিং আর কোন জন্তুর নাই। এই জন্যই বল্‌ছি এ হ'চ্ছে বাংলার এক অদ্ভুত জন্তু। এই শিংয়ের নাম

কি জান? এর নাম হ'চ্ছে খড়্গ। এই খড়্গ এক হাত কিংবা তা'র চেয়ে আরও বেশী লম্বা হয়।

কাঁচা ঘাস, শাক ও প্রায় সব রকম শস্য গণ্ডার খায়। আখ খেতে এরা বড্ড ভালবাসে। এদের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি ভারী তীক্ষ্ণ। অনেক সময় গন্ধ দিয়েই ওরা দূরের শত্রুর আগমন বুঝ্‌তে পারে। সামনের জিনিষ ছাড়া পাশের জিনিষ দেখ্‌তে পায় না ব'লেই গণ্ডার দুর্ব্বল হয়েছে। এই জায়গাই ঈশ্বর একে দুর্ব্বল ক'রে রেখেছেন। হাতীর চোখ দু'টো ছোট হওয়ার জন্য-যেমন সে এক বিষয় দুর্ব্বল, গণ্ডার সম্বন্ধেও তা'ই। সাম্‌নের দিকে সোজা দৌড়ানই হ'চ্ছে গণ্ডারের শত্রু আক্রমণের কায়দা; তখন সাম্‌নে পড়্‌লে কারুরই রক্ষে নেই। যখন এরা গাছ-পালায় গা ঘষ্‌তে থাকে, তখন ঐ সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। সাম্‌নে যা' পায় তা' খড়্গ দিয়ে এরা তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শোনা যায় এদের খড়্গে বিষ-নাশক গুণ আছে। ঐ খড়্গ হ'তে কৌটো, বাটী, জল রাখ্‌বার চোঙা, খেলনা প্রভৃতি তৈয়ার হয়। ভারতবর্ষে এর মাংস অনেকে পবিত্র ব'লে মনে করে। এরা বাছুরের মত শব্দ করে এবং বাঁচে প্রায় ৭০।৮০ বৎসর।

(৩) ভল্লুক

কাল ও ধূসর বর্ণের ভালুকই বাংলা-দেশে পাওয়া যায়। ফল, মূল, নানা রকম শস্য, মাছ, মাংস প্রভৃতি ওরা খায় এবং দুর্গম স্থানে বাস করে। ভল্লুকের শরীরে ঘন-ঘন, লম্বা-লম্বা লোম আছে; সেইজন্য শীতে, বাতাসে ও বৃষ্টিতে এরা কষ্ট পায় না। ওদের কান গোল ও

ছোট এবং চোখ দুটোও ছোট ; পা ও উরু অত্যন্ত শক্ত ও সবল। ভালুকের প্রত্যেক পায়ে পাঁচ পাঁচটী ক'রে আঙ্গুল আছে এবং সাম্‌নের পা দিয়ে এরা হাতের কায করে। এদের আঙ্গুলের আগায় বড় বড় ধারালো নখ আছে। এই জন্তুদের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ-শক্তি খুব প্রবল এবং স্বর গম্ভীর, কর্কশ ও ভয়ানক।

বর্ষার শেষে ভালুক খুব হৃষ্ট-পুষ্ট হয়—শীতের সময় কিছু খায় না, যেন মড়ার মত কাটায়—পাহাড়ের গহ্বরে থাকে। এই সময় এদের সন্তান হয়। ছয় মাস পর্য্যন্ত সন্তান পেটে রেখে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে এরা একেবারে ২।৩টী শাবক প্রসব করে। বাচ্চাগুলো প্রথমে হয় পীত বর্ণ ও পিণ্ডের মত গোলাকার, কেবলমাত্র মুখের দিকে কিছু সরু থাকে। আটাশ দিনের পর ছানাগুলোর চোখ ফোটে। বসন্ত কালের প্রারম্ভে ভালুকী ওদের সঙ্গে নিয়ে বের হয়। অনাহারে অতি কৃশা ও ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে থাকে ব'লে এ সময় ভালুকী খাদ্যের তল্লাসে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। অন্য কিছু না পেলে গাছে উঠে ফল খায়। ভালুক যখন গাছে চড়ে তখন তা'র পেছনের পায়ে ডাল ধরে এবং সাম্‌নের পা দিয়ে, ফল পেড়ে খায়।

ভালুকের মত নিষ্ঠুর জন্তু বড় দেখা যায় না। অতি সামান্য কারণেই ওরা রেগে উঠে এবং যা'র উপর রাগ করে তা'কে তৎক্ষণাৎ নখ দিয়ে ফেঁড়ে বা চিরে ফেলে। সাম্‌নের পা দুটো দিয়ে নিজের কোলের মধ্যে টেনে এনে এমন জোরে চেপে ধরে যে, ধৃত জীবের নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে অবিলম্বে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ভালুকের বেশ বোধ-শক্তি আছে। এরা কখন কখন রাতে ক্ষেতে গিয়ে সেখানকার যব, গম, ধান প্রভৃতি উপ্‌ড়ে ফেলে, মাটিতে আছ্‌ড়ে, শস্য ও বীজ ছড়িয়ে খায়; পেতে শোবার জন্য সময় সময় বিচালিগুলো নিয়ে যায়। এই জন্তরা যেমন খেজুর খেতে ভালবাসে তেমনই মধু খেতেও ভালবাসে। মধু পেলে এরা যেন সব ভুলে যায় এবং এর আহরণের জন্য নানা চাতুরী ও নানা কষ্ট করতেও ছাড়ে না।

বনে ভালুক দুর্দ্দান্ত থাকে। কষ্টে পোষ মানাতে পারলে ভালুক ভারী শান্ত হয়। ভালুকের চামড়ায় জামা, টুপি প্রভৃতি তৈয়ার হয় এবং বরফের দেশের লোকেরা এই চামড়া দিয়ে জুতোর তলা তৈরী করে। ভালুকের নাড়ী অভ্রের মত স্বচ্ছ ব'লে অনেকে ওতে জানালার পর্দ্দা তৈরী করে। ঐ পর্দ্দা ভেদ ক'রে ঘরে বেশ পরিষ্কার আলো আসে। ওদের ঘাড়ের হাড়ে বেশ ধারালো অস্ত্র হয় এবং তা' দিয়ে ঘাস কাটার কায চলে।

(৪) হরিণ

বাংলা-দেশে সচরাচর তিন রকম অর্থাৎ মাস্ক ডিয়ার বা কস্তুরি-মৃগ, স্পটেড-ডিয়ার বা শাদা-ছাব্‌কা ও রেড্‌-ডিয়ার বা লাল-হরিণ দেখা যায়। কস্তুরি-মৃগ হিমালয় অঞ্চলে বাস করে এবং এর নাভিতে যে কস্তুরি হয় তা' বিশেষ উপকারী জিনিষ। সুন্দর-বনে ও অন্যান্য জঙ্গলে শাদা-ছাবকা ও লাল হরিণ পাওয়া যায়।

হরিণের চোখ দুটো বড় সুন্দর ও টানা টানা, দৃষ্টিও ভারী মনোহর। এরা তৃণভোজী এবং খুব জোরে দৌড়তে ও লম্বা লম্বা

লাফাতে পারে। ছাগলের মত কখন এদের ২।৩টী আবার কখন

বাংলা-দেশের হরিণ

বা কেবলমাত্র একটী বাচ্ছা হয়। হরিণের শিং হয় কিন্তু হরিণীর শিং হয় না।

(৫) বানর ও হনুমান

বানর বাংলা-দেশের একটী বিশিষ্ট-প্রাণী। এরা খুব বুদ্ধিমান; মানুষকে যা' কর্‌তে দেখে অবিকল তা' কর্‌তে ওরা চেষ্টা করে। অনুকরণ প্রবৃত্তি ওদের খুব বেশী। মানুষের মত দু'খানি পায়ে ভর দিয়ে এরা চল্‌তে পারে। বানরের হাতে ও পায়ে সমান কায হয় ব'লে ওদের চতুর্হস্ত বা চতুর্ভুজ বলা হয়। গোরু, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির হাত নেই—ওদের চারখানি পা—এজন্য ওদের বলে চতুষ্পদ-জন্তু।

বাংলা-দেশে হনুমান সচরাচর বেশী দেখা যায়। তিন-চার ফিট্ লম্বা হয় ওদের দেহ, লেজটি শরীরের চেয়ে বড়। যখন এক গাছ হ'তে অন্য গাছে লাফিয়ে যায়, তখন দেখ্‌লে ভারী কৌতূহল বোধ করবে এবং আরও দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'বে। এরা নিরামিষাশী; গাছ-পাতা ও ফল-মূল এদের প্রিয়-খাদ্য।

তোমরা রামায়ণ পড়্‌লে দেখ্‌তে পাবে, রাম-রাবণে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা'তে রামের তরফে মন্ত্রী ছিল পরম রামভক্ত হনুমান। হনুমানের কেমন ক'রে একটা ভুল ভেঙ্গে ছিল এবার সে-সম্বন্ধে বল্‌ছি।

শ্রীরামচন্দ্র আরম্ভ করেছেন খুব ঘটা ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ,—ভাণ্ডার রক্ষার ভার পড়েছে হনুমানের উপর। কুশাসনে বসে হনুমান সকলকে সব দিচ্ছেন। কিন্তু কু-অভ্যাস যায় কোথায়—কেউ কিছু চাইতে এলেই দাঁত, মুখ খিঁচিয়ে উঠেন। ঘটনাক্রমে লক্ষ্মণ সেটা দেখ্‌তে পেলেন। কিছুকাল হনুমানকে সরিয়ে রাখা উচিত ব'লে মনে ক'রে তিনি তাঁ'কে বল্‌লেন, "হনুমান! তুমি সকাল বেলায় হিমালয়ে গিয়ে এক মুনিকে নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌বে কারণ ভুলক্রমে তাঁ'কে নিমন্ত্রণ করা হয়নি।" মুনির ঠিকানা দেওয়া হ'ল। হনুমান সোঁ-সোঁ ক'রে ছুটে চল্‌লেন—গিয়ে দেখ্‌লেন—মুনি ত নয়, এক অদ্ভুত জীব। শরীরটা সোনার মানুষের মত কিন্তু মুখটা শূকরের মত। হনুমান বল্‌লেন, "কে আপনি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বাবা হনুমান, আমি অনেক দান করেছিলুম, সেইজন্য সোনার শরীর পয়েছি; কিন্তু কাউকে কটু ছাড়া মিষ্টি কথা বল্‌তাম না, সেই পাপে হয়েছে এই শূকরের মুখ।"

হনুমান সব বুঝ্‌তে পার্‌লেন এবং ফিরে এসে ভাণ্ডারী হলেন বটে কিন্তু সেই থেকে কাউকে কটুকথা বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠ্‌লেন না।

কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপ

হাজার হাজার পোকা-মাকড় এখানে রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পোকা-মাকড়ের অন্ত নেই। প্রাণী তিন রকমের--স্থলচর, জলচর ও উভয়-চর। কতকগুলো পায়ে হাঁটে, কতকগুলো সাঁতার দেয়, কতকগুলো ডানার সাহায্যে বাতাসে উড়ে চলে আর কতকগুলো বুকে ভর দিয়ে চলে। সরীসৃপ চলে বুকে ভর দিয়ে। টিক্‌টিকি, গির্‌গিটী ও অনেক সাপ স্থলচর। ঢোঁড়া সাপ জলচর এবং ব্যাঙ্‌ উভয়-চর। ব্যাঙের কণ্ঠে শব্দ আছে, সাপ শিস্‌ ও গান শুন্‌তে ভালবাসে। সোনা ও কোলা ব্যাঙ এবং অনেক সাপ দেখ্‌তে সুন্দর আবার কতকগুলো কদর্য্য। কোন কোন সরীসৃপ বিষধর। কত অমোঘ ওষুধ আমরা কত সরীসৃপের কাছে পেয়ে থাকি। তোমরা বড় হ'য়ে সে সব জেনো।

বাংলা-দেশে নানা রকমের ও নানা আকারের সাপ পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই খুব বিষাক্ত। কেউটে, গোখ্‌রো, চন্দ্র-বোড়া, করাতে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সাপের কামড়ে প্রতি বৎসর এখানে অনেক লোক ও পশু মারা যায়। এখানে সাপের উৎপাত বর্ষা-কালেই বেশী হয়। বাংলার পাহাড় অঞ্চলের ময়াল-সাপ খুব বড় ও মোটা হয়। তা'রা, ছাগল, বেড়াল, পাখী প্রভৃতি খেয়ে

ফেলে। সাপ ডিম পাড়ে এবং সেগুলো থেকে অনেক বাচ্ছা হয়। সাপের গর্ত্তের ভিতর দিক খুব মসৃণ ও চক্-চকে হয়। ডিম থেকে বাচ্ছা বের হ'বার পরই সাপ সেগুলোকে খেয়ে ফেলে ব'লে সাপিনী লুকিয়ে ডিম পাড়ে। সাপের বিষে আজকাল অনেক উগ্র ওষুধ তৈয়ার হ'চ্ছে। গো-সাপের চামড়ায় জুতো হয়।

টিক্‌টিকি ও গির্‌গিটী

এদেশে নানা আকারের টিক্‌টিকি ও গির্‌গিটী পাওয়া যায়। এখানে সাধারণতঃ দু'রকমের টিক্‌টিকি—শাদা ও কাল ডোরা-টানা—দেখা যায়।

বাংলা-দেশে তেঁতুলে বিছে এবং কাঁক্‌ড়া বিছে দেখা যায়। এদের বিষ আছে এবং কামড়ে অতিশয় জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। জীব-জন্তু অনেক সময় এদের কামড়ে প্রাণ হারায়। তেঁতুলের গাঁটের মত দেখ্‌তে হয় ব'লে ওদের তেঁতুলে বিছে বলে; এরা এক ফুটেরও বেশী লম্বা হয়।

কাঁক্‌ড়ার মত দু'টো দাড়া থাকার জন্য বিচ্ছুকে কাঁক্‌ড়া বিছে বলা হয়। এদের পিছনে লেজের সঙ্গে হুল থাকে এবং সেই হুল ফোটানর সঙ্গে সঙ্গেই এরা বিষ ঢেলে দেয়।

কেঁচো ও কেন্নো তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাক্‌বে। কেন্নোর অনেকগুলি ছোট ছোট পা আছে কিন্তু কেঁচোর তা' নেই। কেঁচো ভারী উপকারী প্রাণী। মাটির ভিতর গর্ত্ত ক'রে থাকে ব'লে ঐগুলো দিয়ে জল ও বায়ু প্রবেশ করে এবং সেজন্য গাছপালা সতেজ হয়। এরা পচা পাতা ও ঘাস খায়। ঐগুলো ওরা নিজেদের গর্ত্তে টেনে

নিয়ে যায়—এতে মাটির সারের কায হয়। যে জমিতে কেঁচো থাকে তা'তে ভাল ফসল হয়। কেঁচো কেমন ক'রে গর্ত্ত ক'রে তা' বল্‌তে পার? ওদের ত হাত-পা নেই। কেঁচোর মাটিতে দেখ্‌তে পাবে যে কাদা দিয়ে সরু দড়ির মত ক'রে সেগুলোকে ঘুরিয়ে, পাকিয়ে ওরা রেখেছে। কেঁচো মুখ দিয়ে মাটি গিল্‌তে থাকে, আর ঐ মাটি ওর পেটের ভেতর দিয়ে সূতোর মত বের হ'য়ে উপরে উঠ্‌তে থাকে। বের হ'বার সময় কেঁচোর শরীরের ভেতরের এক রকম তেলের মত জিনিষের সঙ্গে ঐ মাটি মিশে যায়, এইজন্য ওটা এত সহজে বের হয়। এই নরম মাটির একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে, বোল্‌তা বা ভীমরুলে হুল ফুটালে ক্ষতস্থানে ঐ মাটি লাগাবামাত্র যন্ত্রণা কমে যায়।

বাংলা-দেশে অনেক রকমের কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। এখানকার পঙ্গপাল, রাম-ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং, নানা জাতের প্রজাপতি, তেলাপোকা, আরশুলা, গুব্‌রে-পোকা, শ্যামা-পোকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানকার পাহাড় অঞ্চলে এত রংয়ের প্রজাপতি পাওয়া যায় যে অনেক ইউরোপবাসী ঐ সমস্ত প্রজাপতি নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে, অতি যত্নে বাঁধিয়ে, ঘর সাজিয়ে রাখেন।

মাছ

বাংলা-দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা কথা আছে,

ডাল, ভাত, মাছ ভাজা
যত খাই তত মজা!
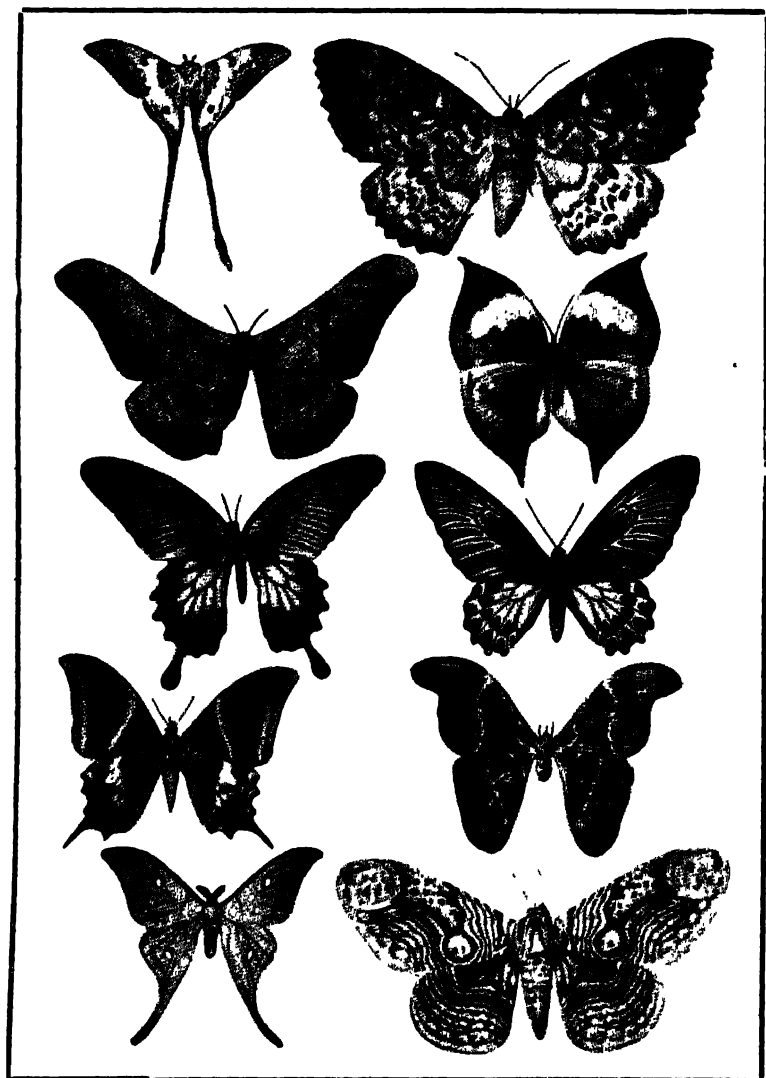
বাংলা-দেশের প্রজাপতি

সত্য সত্যই বাঙ্গালীর কাছে মাছ ভারী প্রিয়-খাদ্য। তোমরা সকলেই বোধ হয় মাছ খাও এবং নীচের বর্ণিত মাছগুলো নিশ্চয়ই দেখেছ—

রুই, কাত্‌লা, কই, মাগুর, চিতল,
সিঙ্গি, পুঁঠি, চিংড়ী, ইলিশ আর শোল।

রুই বা রোহিত মাছ, যা'কে তোমরা পোনা মাছ বল সে হ'চ্ছে মাছের রাজা। এরা কোন খারাপ জিনিষ খায় না, গভীর জলে, গম্ভীর ভাবে, রাজার হালে চলে। কৈ মাছ দেখছ কি? কৈ মাছ তা'দের 'কাণকুয়া' দিয়ে চলে। বৈশাখ মাসে কৈ মাছের ডিম হয়। বোয়াল, বাটকে, পুঁটী, ঘেড়ে, চেলা প্রভৃতি মাছ অখাদ্য ও কুখাদ্য খায় ব'লে অনেকে এদের খায় না। চিংড়ী খুব কমই খারাপ জিনিষ খায়। চিংড়ীকে অনেকে মাছ না ব'লে জলের পোকা বলেন। এক একবারে মাছ অসংখ্য ডিম পাড়ে এবং সেগুলো থেকে হয় অজস্র বাচ্ছা। শোল, চেতল, ছেতেন প্রভৃতির বংশ এত বৃদ্ধি পায় যে মনে হয় যেন এ বুঝি আর ফুরোবার নয়।

তিমি প্রভৃতির মত বৃহৎকায় মাছ বাংলা-দেশে না থাক্‌লেও এক একটা রুই, কাত্‌লা, চেতল কম বড় হয় না। এদেশেই মকর ছিল, হাঙ্গর ছিল এবং বোধ হয় এখনও আছে। গঙ্গাদেবী মকরবাহিনী, মাছে চড়ে তিনি বেড়ান; এ দেশেই ভগবান মৎস্য অবতার হয়েছিলেন—এসব কাহিনী তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাক্‌বে। তা'হলেই তোমরা বুঝ্‌ছ যে কতদিন আগে থেকে এদেশ নানা রকমের মাছের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইলিশ, তপ্‌সে, ভেট্‌কী, ভাঙ্গন, পাব্‌দা প্রভৃতি খুব মুখ-রোচক। এদেশের চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর নানা রকমের সমুদ্রের মাছ অনেকেই খেয়ে থাকেন। চট্টগ্রামের "নোনা ও সুঁট্‌কী" মাছ অনেক জায়গায় চালান যায়। মাছ ধর্‌বার জন্য বাঙ্গালী জেলেরা কত যে কৌশল ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করেছে তা'র ইয়ত্তা নেই। এদেশে ধীবর বা জেলে ব'লে একটা সম্প্রদায়ই আছে, তাদের মুখ্য উপজীবিকা হ'চ্ছে মাছ-ধরা। জেলে ডিঙ্গীতে চড়ে শত শত জেলে নদীতে মাছ ধরে। খরার জাল, ঝাঁকি জাল, জালি, পল, টেঁটা, বঁড়শী, ধর্ম্মজাল, বেড়াজাল, শোলাজাল, কৈ জাল প্রভৃতি বাঙ্গালী জেলের যন্ত্রপাতি কী চমৎকার! বাইন ও কুঁচো মাছ ধর্‌বার জন্য বাঁশের চোঙ্গা পেতে রেখে এরা প্রচুর মাছ ধরে। যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে জেলেরা কত বড় বড় জাল দিয়ে কত মাছ ধরে দেখ্‌লে তোমরা অবাক্ হ'য়ে যাবে! বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরা অনেক সৌখীন লোকের একটা সখ। মৃগেল, কাল বাউস, চেলা, মৌরলা, সরল-পুঁটী, মাগুর, সিঙ্গী, বাচা, টেংরা, রিঠা, চাঁদা, রং চাঁদা, খলিসা, বেলে, সুবর্ণ-খড়্‌কে, খরুল্লা, লেঠা, হাড়বেজে, রায়েক, শাকৈ, গল্‌দা, চিংড়ী, বেতরঙ্গী, পেতিকৈলা, ভেউস্‌, কালকুনি, চান্দিমা, গরচা, চ্যাক্‌মেকা, নোরা প্রভৃতি মাছ এদেশের বিল, দীগি, দহ, খাল, পুকুর, নদী ও নালায় প্রচুর পাওয়া যায়।

মাছের রক্ত ঠাণ্ডা। অধিকাংশ মাছেরই গা শল্ক বা আঁইশে ঢাকা। পৃথিবীতে প্রায় ৮০০০ জাতের মাছ আছে।

কাঁক্‌ড়া

কাঁক্‌ড়া এদেশের একটা বিচিত্র প্রাণী এবং এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। বানরেরা কাঁক্‌ড়া খেতে খুব ভালবাসে। চালাকী ক'রে এরা লেজ কাঁকড়ার গর্ত্তে ঢুকিয়ে দেয় এবং যখন কাঁক্‌ড়া ওটা জড়িয়ে ধরে তখন তুলে নিয়ে মেরে খায়। অনেক পাখী কাঁক্‌ড়া খায়। এখানকার পুকুর, নদী ও সমুদ্রে নানা রকম কাঁক্‌ড়া পাওয়া যায়। সমুদ্রের কাঁক্‌ড়া অনেক সময় বেশ বড় বড় হয়। বর্ষাকালে যদি কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাও তা' হলে দেখ্‌বে কত ছোট ছোট কাঁক্‌ড়ার বাচ্ছা তোমাদেব কাপড়ে উঠে জ্বালাতন কর্‌ছে। অনেকে বর্ষার সময় গঙ্গার কাঁক্‌ড়া তুলে নিয়ে পুকুড়ে ছেড়ে দেয়। সেগুলো কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বড় হয়।

পাখী

এবার পাখীর কথা বল্‌ছি। সখের জন্য সৌখীন লোকেরা দু'চারটা পাখী পোষেন। পাখী নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁ'রা জানিয়াছেন যে ভারতে প্রায় ১৬১৭ জাতের পাখী দেখা যায়; তা'র মধ্যে প্রায় ১৩৩৬ জাত ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ায়। ভারতবর্ষে যে সমস্ত পাখী দেখা যায় তা'র অধিকাংশই তোমাদের বাংলা-দেশে জন্মে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাক্‌বে—

"মোরগ, পায়রা, হাঁস, ময়ূর, পেচক,
শকুনি, বুলবুল, শুক, কোকিল, চাতক;
বক, ঘুঘু, বাজ, চিল, ময়না, পাপিয়া,
কাকাতুয়া, শ্যামা, কাক, সারস, মুনিয়া।"

বাংলা-দেশের হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলের ট্রাগোপান (উপরে),
কালিজ্ (মধ্যস্থলে) ও ফেজেণ্ট (নীচে)

প্রভাতে মোরগের 'কক্র-কো', হাঁসের 'প্যাক্-প্যাক্', চড়াইয়ের 'কিচির-কিচ্,' পায়রার 'বক্ বকুম্ কুম্,' কাকের 'কা কা' ও কোকিলের 'কুহু, কুহু' ডাক নিশ্চয়ই শুনে থাক্‌বে। কত রকমের পাখী নানা রকম ডাক্‌তে ডাক্‌তে এখানে সেখানে উড়ে বেড়ায়। এদেশের পাখীগুলোর ডানায় কত রকম রং করা তা' দেখ্‌লে যেন চোখ জুড়োয়। বাংলা-দেশে এক শ্রেণীর জ্যোতিষ-জানা পণ্ডিত আছেন যাঁ'রা পাখীর ডাক শুনে মঙ্গলামঙ্গল ব'লে দিতে পারেন। তাঁ'দের বলে 'কাক চরিত্র মশাই'।

পাখী দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, এদের স্বরও তেমন শ্রুতি-মধুর। তবে কতকগুলো কর্কশ-কণ্ঠ পাখীও আছে—যেমন কাক, ভুতুম পেচা, নিমপাখী, চিল প্রভৃতি। কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, ময়না প্রভৃতির কণ্ঠস্বর কী মধুর, কী চমৎকার! এগুলো শুনে মনে হয় যেন সারাক্ষণই শুনি। পাখীকে সকলেই ভালবাসে। নারায়ণের বাহন মস্ত বড় গরুড় পাখী, আর রামায়ণের সেই সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি পাখীর কথা হয় ত শুনেছ। তেমন বড় পাখী এখন চোখে না পড়্‌লেও এক একটা গৃধ্র কম বড় নয়। কাক, শকুনি, গৃধ্র প্রভৃতি পাখী রাতদিন উচ্ছিষ্ট ও মৃতদেহ ভক্ষণ করে ব'লে হয় ত তোমরা এদের ঘৃণা কর—অত্যন্ত কদর্য্য জিনিষ আহার ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবহীন ব'লে হয় ত তাচ্ছিল্য কর—কিন্তু ঐ সকল পাখী তোমাদের পরম বন্ধু ও বিশেষ উপকারী জীব, তা' বোধ হয় তোমরা জান না। ওরা না থাক্‌লে তোমরা পৃথিবীতে বাসই কর্‌তে পার্‌তে না। পচা ও গলা মৃত জন্তু ভক্ষণ ক'রে এই পাখীগুলো তোমাদের বিশেষ উপকার করে। ওরা যদি ঐ সব না খেত বা পরিষ্কার কর্‌ত

তা'হলে গলিত শবের পচা তুর্গন্ধে বায়ুমণ্ডল দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে যেত। কাক ও শকুনির কাছে তোমরা শিখ্‌বে প্রাতরুত্থান—কত দীর্ঘজীবি ওরা !

চক্রবাক পাখী ব্যাধের শরে মরেছিল আর বাল্মীকি শোকে শ্লোক রচনা করেছিলেন এ গল্প তোমরা বড় হ'য়ে পড়্‌বে। তোমরা হয় ত নল রাজার উপাখ্যান শুনেছ, কতকগুলো হাঁস দূত হয়ে গিয়েছিল দময়ন্তীর কাছে। ডাহুক, ফিঙে, হল্‌দে পাখী বেনে-বউ তোমরা হয় ত অনেকে দেখেছ ? এই হল্‌দে পাখীর 'বউ কথা কও' ও ঘুঘুর 'ঘুঘুর-র্‌-র্‌' ডাক পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুন্‌তে পাবে।

তোমরা মনে কর'না যে তোমরা কোন অপরাধ কর্‌লে, তোমাদেরই কেবল বিচার হয়, পঞ্চায়েৎ বসে বা শাস্তি হয়। একটা সত্য ঘটনা বল্‌ছি, শোন। সে অনেক দিনের কথা, একজন অধ্যাপক বলেছিলেন যে তিনি এক কাক-সভা দেখেছিলেন। তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখ্‌লেন, রাস্তার ধারে, খুব বড় এক কাকের সভা বসেছে। অসংখ্য কাক, একত্র বসে সভা কর্‌ছে। সেটা যেন একটা ব্যূহ ; সেখানকার কাকগুলো একটা কেন্দ্রস্থ কাকের দিকে ঝুঁকে চীৎকার কর্‌ছে ও যেন সকলে সেই কাকটাকে কোন এক অপরাধের জন্য ভৎর্সনা কর্‌ছে। কিছুক্ষণ এমনই চীৎকার ক'রে শেষে কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক একটা কাক সেই মধ্যের কাকটাকে সজোরে চঞ্চুর আঘাত ক'রে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ অতিকষ্টে দণ্ড সহ্য ক'রে শেষে দণ্ডিত কাকটী উড়ে গেল। কাকেরা এই ভাবে যেন পঞ্চায়েতী প্রথায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করলে।

বাজ-পাখী বড় ঝগড়াটে, বুলবুল আবার তেমনই শান্ত। এদেশের এক একটা পাখীর এক এক প্রকৃতি। তোমরা নিশ্চয়ই ময়ূর দেখেছ। এ কবিতাটী পড়েছ কি?

"আকাশে দে'খিলে মেঘ পেখম ধরিয়া।
ময়ূর নাচিতে থাকে অধীর হইয়া।"

এক ছোট পাখীকে ধরে একদিন একটি ছেলে যা' বলেছিল, সে কবিতাটী শোন—

"ছোট পাখী, ছোট পাখী এস মোর কাছে,
পরিপাটী খাঁচা এক তোমা' তরে আছে;
সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে
পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তুমি খেতে।"

পাখী ছেলেটীর কথা শুনে যা' উত্তর দিয়েছিল, সেটা শোন—

"উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি'
হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।"

বাংলা-দেশের পাহাড় অঞ্চলের নানা রকমের ফেজেণ্ট-বার্ড ও জলের তিন রকমের মাছ-রাঙার রং ও গড়ন দেখ্‌লে প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টি ও রং ফলানো যে কত উঁচু দরের তা' বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। এই পাখীগুলো দেখ্‌তে সত্য সত্যই খুব চমৎকার।

এখানকার টিয়া, চন্দনা ও ফুলটুসি বেশ পোষ মানে এবং মানুষের মত নানা কথা বল্‌তে পারে। পাপিয়ার 'চোখ গেল' আওয়াজ কী মধুর! নানা রকম বুলির অনুকরণ কর্‌তে পারে ব'লে এখানকার

শালিকগুলোর নাম রাখা হয়েছে 'হব্‌বোলা।' এখানকার সাধারণ ও কালো তিতির অনেক হিন্দুস্থানী পুষে থাকে। এদেশের বুল্‌বুলের

বাংলা-দেশের হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলের মাছ-রাঙ্গা পাখী

বাংলা-দেশের ব্রাউন-হেড্‌ মাছ-রাঙ্গা

লড়াই প্রসিদ্ধ। আগে অনেক লোক জড়ো হ'য়ে এসব দেখ্‌ত—সে কী কাণ্ড!

পাখীরা ছ' জাতের হয়—(১) শিকারী; এদের ঠোঁট শক্ত, অগ্রভাগ বাঁকা ও পা দু'খানা কঠিন, বাঁকা ও ধারাল। শকুনি, বাজ, পেঁচা প্রভৃতি এই জাতীয়।

(২) আশ্রয়ী পাখী; এরা বাসা তৈয়ার ক'রে তা'তে থাকে। কাক, শালিক, ঘুঘু, বাবুই, চিল হ'চ্ছে এই শ্রেণীর।

(৩) বিক্ষিরক; এরা আহারের জন্য নখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে। মোরগ, ময়ুর, পায়রা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

(৪) জলচর; এদের পা দু'খানি লম্বা এবং গলাও প্রায় পায়েরই মত। অল্প জলা জায়গায় লম্বা পা ফেলে এরা মাছ, শামুক ইত্যাদি ধর্‌বার জন্য বেড়ায়। এ সময় এদের গলা নামিয়ে চলে। বক, হাড়গিলা এই শ্রেণীর।

(৫) সন্তরক; এদের পা দু'খানি ছোট এবং আঙ্গুলগুলো পাত্‌লা চামড়ার দ্বারা সংযুক্ত। হাঁস, রাজহাস এই শ্রেণীর।

(৬) দ্রুতপদ; এরা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাটির উপর দৌড়ে চলে—শূন্যে বেশী উড়্‌তে পারে না—পাখাগুলো নিস্তেজ। ময়ূর এই শ্রেণীর।

বাদুড়

বাংলা-দেশে বাদুড়, চাম্‌চিকে ও তাল-চড়াই অনেক পাওয়া যায়। সন্ধ্যা হ'লেই এরা বাসা হ'তে বেরিয়ে খাবারের চেষ্টায় উড়ে বেড়ায়।

তোমরা বাদুড় দেখেছ? বল ত, বাদুড় পাখী না জন্তু? পাখীর মত বাদুড়ের পাখা আছে, উড়ে বেড়ায় কিন্তু পাখীর মত ওদের পালক নেই। পাখীর মত যা' দেখ, ও হ'চ্ছে ওদের দু'খানি হাত; ঐ হাতের আঙ্গুল দেখেছ? সেগুলো কিন্তু খুব লম্বা আর পাত্‌লা চামড়া দিয়ে জোড়া। হাতের বুড়ো আঙ্গুল দু'টো সকলের ছোট এবং সেগুলোর উপরে রয়েছে এক একটা বাঁকা নখ। পায়ের আঙ্গুলেও অল্প বাঁকা ধারাল নখ রয়েছে। ওগুলো ডালে, দেওয়ালে লাগিয়ে বাদুড় রাস্তার ক্লান্তি দূর করে। পাখীর চোখ আছে, দাঁত নাই কিন্তু বাদুড়ের দাঁত আছে চোখ নাই। পাখী
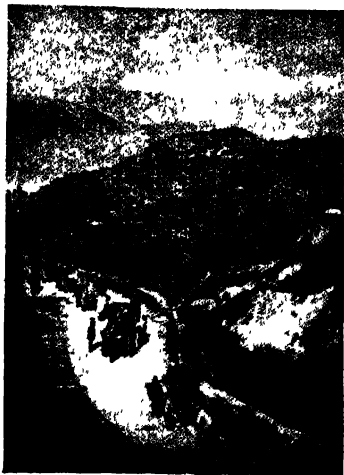
ডিম পাড়ে আর এরা প্রসব করে বাচ্ছা এবং খেতে দেয় স্তন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এদের ছানা হয়। প্রায় দু'মাস বাচ্ছারা মায়ের সঙ্গে থাকে। বাদুড় দিনে ঘুমোয় আর আহারের অন্বেষণে বা'র হয় রাত্রে। এরা ভোর বেলা ফিরে এসে বিকট রবে তা'দের আড্ডায় মারা-মারি, চেঁচামেচি সুরু ক'রে দেয় এবং সুবিধামত নখ বসিয়ে অধো-মুখে ঝুলে বিশ্রাম করে। কলা, পেয়ারা, সুপারী এদের বড় প্রিয়। ওরা বার-চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ডানা দুটো মেল্‌লে এক দিক হতে অন্য দিক হয় প্রায় দু'হাত। এদের মাথা কালো, গলা ও হাত হল্‌দে এবং ডানা দু'খানা ধূসর।

দার্জ্জিলিংয়ের রাস্তা। এখানকার গাছে অনেক বাদুড় দেখা যায়।

বাদুড় উড়ে উড়ে বহুদূর যেতে পারে। একটা বাদুড়ের কাণ্ড শোন। একজন সাহেব জাহাজে চড়ে যাচ্ছিলেন। সমুদ্র হ'তে কূল দু'শ মাইল দূরে, এমন সময় তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন যে হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাদুড় এসে বস্‌ল তাঁ'র জাহাজের এক মাস্তলের উপর। একজন খালাসীকে একটা টাকা পুরস্কার দিয়ে সাহেব বাদুড়টাকে ধরালেন এবং খুব যত্নে ফল খাইয়ে পুষ্‌তে লাগ্‌লেন। বাদুড়টা বেশ পোষ মান্‌ল—বল ত কী কাণ্ড! দু'শ মাইল দূরে চলে গেছে

বাদুড়—ডাঙ্গা থেকে সমুদ্রের জলের উপর—জাহাজের মাস্তুলে। বাদুড় পাখী নয়—স্তন্যপায়ী জীব, কিন্তু অনেকে এদের পাখীর শ্রেণীভূক্ত ক'রে ভুল করেন।

খনিজ ধাতু

বাংলা-দেশে কয়লা, লোহা ও তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানে লোহার ও তামার কারখানা এবং রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ বিখ্যাত। সারা বাংলায় প্রায় এক শ' কয়লার খনি আছে এবং সেগুলো থেকে বছরে প্রায় ১৫,০০০০০ টন কয়লা তোলা হয়।

সামুদ্রিক-দ্রব্য

বাংলা-দেশের যেন মনস্তুষ্টির জন্য বিরাট ও বিশাল সমুদ্র তা'কে উপহার দেয় নানারকম জিনিষ। সেইজন্য এখানকার সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত ক'রে বঙ্গবাসী পায় প্রচুর লবণ। এখানকার সমুদ্রের ঝিনুক দিয়ে লোকে সাজায় বাড়ী আর করে ঘুটিং-চূণ। নানা রকমের সমুদ্রের মাছ খেয়ে ও চালান দিয়ে বাংলার লোক পায় প্রচুর আনন্দ। এদেশের সমুদ্রের নিকটের মাটি থেকে পাওয়া যায় সোরা।

বাংলার কতিপয় বিখ্যাত স্থান

—কলিকাতা—

কলিকাতা বা কল্‌কাতার নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। যা'রা দেখেছ তা'রা ত ভালই ক'রেছ আর যা'রা দেখনি, তা'রা নিশ্চয় দেখ্‌বে। এখানেই হ'চ্ছে বাঙ্গালীর যত সব বড় বড় গৌরবের জিনিষ, বড় বড় লোকের বাসস্থান।

কল্‌কাতা বাংলার রাজধানী ; কিছুদিন পূর্ব্বেই ছিল ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী, কিন্তু ১৯১২ সালে দিল্লীতে সম্রাটের আদেশে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এখানে প্রায় তের লাখ লোক আছে। সব দেশের সব রকম মানুষ একত্র হ'য়ে কল্‌কাতাকে করেছে যেন মানুষের এক বিচিত্র স্থান। যে রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না, সেই বৃটিশ-রাজত্বে লণ্ডন ভিন্ন এত বড় সহর আর নাই। কল্‌কাতার সুদৃশ্য দালান ও এমারতের সীমা-পরিসীমা নাই। সৌধ কিরীটিনী লঙ্কার মত বাংলার এই মহানগরী সৌধময়ী প্রাসাদপুরী (city of palaces)। কয়লার খনি দূরে নয়—বর্দ্ধমানে, রাণীগঞ্জে। এজন্য কল্‌কাতায় ও তা'র উপকণ্ঠে বহু কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে ও হ'চ্ছে ; সমুদ্র হ'তে মাত্র ৮৬ মাইল দূরে—কাযেই সমুদ্রগামী বাণিজ্য-জাহাজ এখানে অনায়াসে যাতায়াত করে। সারা ভারতের বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ কায এই কল্‌কাতাতেই হয়। শুনে আশ্চর্য্য হবে পাটের কারবারে কলকাতার সমকক্ষ বন্দর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। বিদ্যার জন্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক ভাল ভাল স্কুল, মাদ্রাসা আছে। দেখ্‌বার জিনিষের এখানে নেই অন্ত। এখানকার মিউজিয়াম বা যাদুঘর, আলিপুরের চিড়িয়াখানা বিখ্যাত। গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, হাইকোর্ট, ইডেন-গর্ডেন, মনুমেণ্ট্, কালীঘাটের কালী, শেয়ালদহ ও হাওড়ার রেল-জংসন, হাওড়ার পুল, পরেশনাথের মন্দির, জোড়া-গীর্জ্জা, নাখোদা-মস্‌জিদ্, বৌদ্ধ-চৈতন্য-বিহার, ব্রাহ্ম-মন্দিব সবই বিচিত্র। শত শত লাইব্রেরী, পত্রিকার কার্য্যালয়, অফিস্, বিরাট এক একটা ইন্‌সিওরেন্স অফিস্ ও ব্যাঙ্ক সবই দেখ্‌বার বস্তু। লাটসাহেবের বাড়ী, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের

বাড়ী, মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, মাড়োয়ারী হাসপাতাল,
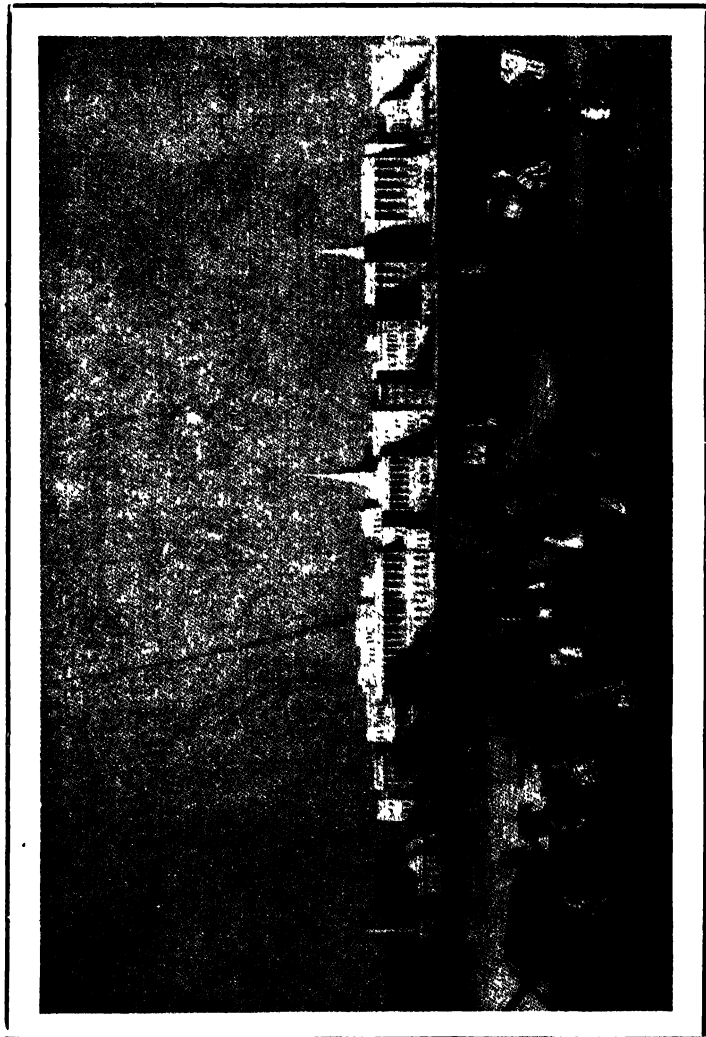
পুরাতন কলিকাতার এস্প্ল্যানেডের দৃশ্য

ডাফরীণ হাসপাতাল, ইডেন হাসপাতাল, কর্পোরেশন অফিস্,

ইলিক্‌ট্রি্‌ক্‌ অফিস্‌, সাহেবদের চিত্র-গৃহ মেট্রো ও লাইট্‌-হউস্‌ এবং বাঙ্গালীদের চিত্রা, রূপবাণী, নাট্য-নিকেতন প্রভৃতি মানুষের বিশেষ আকর্ষণের জিনিষ। এখানে সুখ-সুবিধার অন্ত নাই। বেড়াবার জন্য ঢাকুরিয়ার কৃত্রিম লেক্‌ এক অপূর্ব্ব স্থান হয়েছে। কর্পোরেশন ও ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট্‌ ট্রাষ্টের চেষ্টায় অপূর্ব্ব ও বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সহরের জল সরবরাহের বিরাট ব্যবস্থা টালায় গিয়ে দেখ্‌তে পার। আবর্জ্জনা ফেল্‌বার বন্দোবস্ত দেখ্‌লে চমৎকৃত হ'বে, ধাপার মাঠ দেখো। গঙ্গার উপরে নূতন পুল হ'চ্ছে। কত জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা নঙ্গর ক'রে আছে। কিং জর্জ্জেস্‌ ডক্‌ এক অপূর্ব্ব জিনিষ। বাংলা-দেশের এক বিচিত্র স্থান হ'চ্ছে এই কল্‌কাতা।

—ঢাকা—

কলিকাতা যেমন পশ্চিম বঙ্গের, ঢাকা তেমন পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নগর। এর পূর্ব্ব নাম ছিল জাহাঙ্গীর নগর। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে নবাব ইসমাইল খাঁ এর প্রতিষ্ঠা করেন। এ হ'চ্ছে, তোমাদের দেশের দ্বিতীয় রাজধানী। ঢাকা বুড়ী গঙ্গা ব'লে এক নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই সহর খুব পুরানো ও বিখ্যাত। ঢাকা কিছুদিন বাংলার রাজধানীই ছিল—অবশ্য তখন শাসনকর্ত্তা ছিলেন মোসলমান। কল্‌কাতার দক্ষিণে যেমন আছেন কালীঘাটের কালী, তেমনই ঢাকার উত্তরে রমনার মাঠের কাছে আছেন ঢাকেশ্বরী কালী। যেখানে প্রতিষ্ঠাতা নবাব ইস্‌মাইল খাঁ প্রথম পদার্পণ করেন তাঁ'র নাম এখনও ইস্‌লামপুর হ'য়ে রয়েছে।

ঢাকায় বিখ্যাত স্থান ও দর্শনীয় বস্তুর অন্ত নাই। এখানে যে মস্‌লিন কাপড় হ'ত তেমন কাপড় পৃথিবীর আর কোথায়ও হয়নি—এখনও যা' হয় তা'র তুলনা নাই—এত সূক্ষ্ম কাপড় সত্যিই বিস্ময়কর। ইংরাজেরা এখান থেকে বহু টাকার মস্‌লিন নানা দেশে চালান দিতেন। তাঁ'দের বহু কুঠি ছিল। সোনা-রূপার অলংকার ও বাসনের জন্য, শাঁখা ও মিহি কাপড়ের জন্য এখনও ঢাকা জগদ্বিখ্যাত।
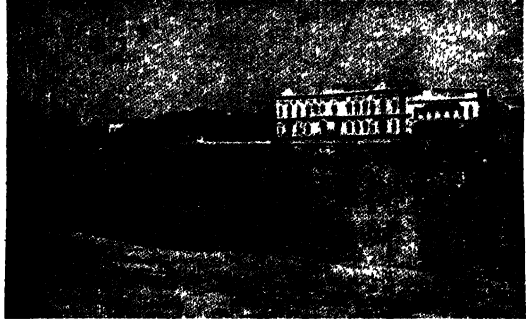
ঢাকার বুড়ি গঙ্গার তীরে নবাবের প্রাসাদ

এখানে নূতন আদর্শে ছাত্রাবাস-সহ একটী বিশ্ববিদ্যালয় (residential University) স্থাপিত হয়েছে। কলিকাতার গড়ের মাঠের মত সুন্দর রমনার মাঠ সত্যিই ভারী চমৎকার। বিক্রমপুর এই জেলারই একটী পরগণা। কেন ঢাকা নাম হ'ল, এক একজনে এক এক রকম বলেন—ঢক নামে গাছ এখানে খুব জন্মাত। কেউ কেউ বলেন সেই হ'তেই এই নাম; কেউ বলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী হ'তেই এই নাম। প্রতিষ্ঠাতা নবাবের কানে ঢাকের শব্দ যতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছে ছিল ততদূর পর্য্যন্ত তিনি এই নামে নগর করেছিলেন। বিক্রমপুরের মত শিক্ষিত লোকের স্থান বাংলাদেশে খুব কম আছে। সত্য সত্যই—

"চাঁদ কেদারের প্রতাপে প্রচুর রঞ্জিত ললাট যা'র
এই সেই ভূমি বিক্রমপুর, বন্দনীয় সবাকার।
বৌদ্ধ দীপঙ্কর জনমি যেথায় বাড়ান মায়ের মান।
জ্ঞানার্থীর এই বিখ্যাত ভূমি, প্রকৃতির সেরা দান।"

এ জেলার রামপাল নানা কারণে বিখ্যাত। গজারী গাছ এখনও কীর্ত্তি ঘোষণা কর্‌ছে। ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন বিখ্যাত জমিদার। নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জ ঢাকার বন্দর ও পাটের জন্য বিখ্যাত এবং মস্ত বড় ব্যবসায়ের জায়গা। অদূরের লাঙ্গলবান্দ ব্রহ্মপুত্র নদের এক প্রাচীন খাত। ব্রহ্মপুত্রে স্নানোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। ঢাকার পাল বংশের কেল্লা ও মস্‌জিদ্‌ দর্শনীয় বস্তু। সহরের পশ্চিমে যাবতীয় পুরাতন কীর্ত্তি বিদ্যমান। নবাব ইস্‌মাইল খাঁর দুর্গ এখন আর চিন্‌তে পার্‌বে না। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি গুরখা সৈন্যদের বাসোপযোগী কতকগুলি দালান ঐ প্রাচীন দুর্গের উপর নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। নবাব সাহসুজার আদেশে চক্‌বাজারের নিকটই ছোট কাট্‌রা ও বড় কাট্‌রা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে এখানে দু'টো কামান ছিল। একটা এখন বুড়ী গঙ্গার উত্তরে সদর ঘাটে রয়েছে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল হিন্দুদের এক বিরাট কাণ্ড। মোসলমানদের ইমামবাড়া এখানকার অতি প্রসিদ্ধ স্থান। মহরমের সময় এ স্থান জনাকীর্ণ হ'য়ে যায়।

—চট্টগ্রাম—

চট্টগ্রাম বা চিটাগাং ভারি চমৎকার সহর। বাংলা-দেশের পাহাড়ে সহর দার্জ্জিলিংয়ের পর এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-ভূষিত সহর

আর নাই। তা' ছাড়া সহরটী আবার সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ব'লে বাণিজ্য প্রধান হয়েছে। এখানে রাত দিন, ষ্টীমার ও জাহাজে আর বড় বড় নৌকায় নৌকায় নানা মালপত্র আমদানী রপ্তানী হ'চ্ছে। আসাম বেঙ্গল রেলপথদ্বারা চট্টগ্রাম আসামের সঙ্গে সংযুক্ত; আসামের চা ও আস্‌বাব তৈয়ারীর নানা উপকরণ ও কাঠ এবং চাল ও নানা শস্য এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এখানে জাহাজ তৈয়ারী হয়। প্রথম শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে। এই

বাংলা-দেশের পাহাড়ি কুলিরা মাল বহন কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে

জেলার পাহাড়ের উপর চন্দ্রনাথ নামে বিখ্যাত হিন্দু তীর্থ আছে। শিব রাত্রির সময় লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী এখানে আসেন। এ সময় এখানে খুব বড় মেলা বসে। চন্দ্রনাথ দেখ্‌বার মতই দেবতা। আদিনাথও বিখ্যাত। সীতাকুণ্ড ও বাড়বা-কুণ্ড এই দুইটী

প্রস্রবণ এবং সহস্রধারা বিচিত্র দর্শনীয় বস্তু। বহু মোসলমান পীর ও ফকিরের আস্তানা এবং সমাধি আছে। এর উত্তরে শ্রীহট্ট ও কাছাড়, পূর্ব্বে লুসাই পাহাড়, পশ্চিমে বিরাট মেঘনা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থাকায় এস্থান বিচিত্র। চা, তূলা, কাঠ, ধান, পাঠ, সুপারি, নারিকেল এখানে প্রচুর জন্মে; পিতল ও কাঁসার বাসন, নানা রকম কাপড়, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, বেতের তৈয়ারী জিনিষ পাওয়া যায়। প্রত্যেক উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীর বাসস্থান এক একটী পাহাড়ের উপর। সমস্ত আফিস্ এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর এক মনোরম প্রাসাদে স্থাপিত।

—নবদ্বীপ—

নবদ্বীপ বাংলা-দেশের সংস্কৃত শিখ্‌বার একটা কেন্দ্রস্থান। মোসলমান আমলের পূর্ব্বে এই নগর অনেকদিন বাংলার রাজধানীর গৌরব বহন কর্‌ত।

এখানেই ভুবনবিখ্যাত শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব জন্ম গ্রহণ ও তাঁ'র ভুবন পাবনী লীলা করেছিলেন। নবদ্বীপ হিন্দুর—বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

—মুর্শিদাবাদ—

ভাগীরথী এই জেলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে—পশ্চিমাংশকে বলা হ'ত রাঢ় ও পূর্ব্বাংশকে বলা হ'ত বাগড়ি। মুর্শিদাবাদের প্রধান নগর হ'চ্ছে এখন বহরমপুর, কিন্তু এককালে ছিল মুর্শিদাবাদই।

মুর্শিদাবাদ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবগণের রাজধানী। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন কীর্ত্তি-মণ্ডিত নগর দেখ্‌লে তোমরা কত কথাই

না জান্‌তে চাইবে। পার ত মুর্শিদাবাদ একবার দেখে এসো। এখনও এ জায়গা রেশমের কাপড়, বালাপোষ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখানে আছে।

—গৌড়—

বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় এখন আর নাই, আছে শুধু তা'র ভগ্নাবশেষ। গৌড় বাংলার মোসলমান শাসনকর্ত্তা এবং সুলতানগণের একদিন রাজধানী ছিল। গৌড়ের সৌধমালার শোভার তুলনা ছিল না। এখনও ঐ সৌধমালার দু' চারটী থাক্‌লেও বাকীগুলো ভেঙ্গে গেছে এবং যা' আছে তা' নষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

গৌড় বর্ত্তমান মালদহ জেলায় ছিল। কখন, কে যে এ রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা' তত ভাল ক'রে জানা যায় না। মোসলমান বিজয়ের প্রথম হ'তেই গৌড়ের বিবরণ মোসলমানগণের ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। মোসলমানেরা বঙ্গ-বিজয় সম্পন্ন ক'রে হিন্দুদের রাজধানী গৌড়ে আপনাদের বাস-ভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তা'রপর প্রায় ৩০০ বছর মোসলমান শাসনকর্ত্তা ও সুলতানগণের বাসস্থান ছিল। এই সময়ে বহু অতুল সৌধশালী অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

বহুদিন পর মৈনাম খাঁর সময়ে মহামারী উপস্থিত হ'য়ে গৌড় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। গৌড় একেবারে জনশূন্য হ'য়ে যায়। তা'রপর আর বসতি স্থাপিত হয়নি।

গৌড়ের শ্রেষ্ঠ সৌধের নাম "সোনা মস্‌জিদ্"। কালো মার্ব্বেল পাথরে অঙ্গ-সৌষ্ঠব করা হয়েছিল এই অপূর্ব্ব মস্‌জিদের। সোলতান

নশরৎ সাহ ৯৩২ হিজরীতে এর নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জিদের জায়গায় জায়গায় ছিল সোনার কারু-কার্য্য। এইজন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছিল "সোনা মস্‌জিদ্"। এঁর অন্য কীর্ত্তি "কদম-রসুল মস্‌জিদ্"। মস্‌জিদের মধ্যে হজরৎ মোহম্মদের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হওয়ায় এর নাম রাখা হয় "কদম-রসুল"।

ফতে খাঁর সমাধি, মিনার, ছোট সোনা মস্‌জিদ্ এখনও প্রায় অক্ষুন্ন আছে। এক লক্ষ্মী মস্‌জিদ্, ছত্রিশ গড়, আদিনা মস্‌জিদ্ প্রভৃতি দেখ্‌বার জিনিষ। এক লক্ষী মস্‌জিদে সোলতান গীয়াসউদ্দিন, তাঁ'র স্ত্রী ও পুত্র-বধূর দেহ সমাহিত হয়েছে।

গভীর জঙ্গলাবৃত "ছত্রিশ গড়ে" সোলতান সেকেন্দর শাহ বাস কর্‌তেন ব'লে শোনা যায়। একটী দীঘির পাশে "ছত্রিশগড় প্রাসাদ" নির্ম্মিত হয়েছিল। এই প্রাসাদ অতি সুরক্ষিত ছিল। এখনও চার দিকে সুদৃঢ় দুর্গের নানা চিহ্ন দেখা যায়। এখান হ'তে এক মাইল পশ্চিমে হ'চ্ছে আদিনা মস্‌জিদ, এটাও সেকেন্দর শাহের কীর্ত্তি।

সোনার বাংলার সোনার ছেলে

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

এতক্ষণ তোমরা বাংলা-দেশের নানা কথা শুন্‌লে। এবার যাঁ'রা বাংলা-দেশের প্রকৃত গৌরব—যাঁ'দের মত মূল্যবান্ বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁ'দের কথা কিছু কিছু বল্‌ছি।

সুখময় বসন্ত এসেছে, সোনার বাংলায়। ১৮৩৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী—শুভা ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি সেদিন—পিক কণ্ঠের মধুর কাকলীতে ও পুষ্পের স্নিগ্ধ গন্ধে পল্লী-ভবন আমোদিত হ'চ্ছিল।

স্থাবর জঙ্গমের মনে বড় আনন্দ ; কোন্ এক আকাঙ্ক্ষিতের আগমন সম্ভাবনায় যেন তা'রা বিপুল পুলকে স্পন্দিত ও উল্লাসিত হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

প্রকৃতির এই আনন্দোৎসবের মধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হ'লেন।

বাংলার যে পুণ্য-ভূমিতে তিনি আবির্ভূত হ'লেন তা'র নাম কামারপুকুর। কামারপুকুর হ'চ্ছে হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার ৮ মাইল পশ্চিমে। পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁ'র পিতা আর চন্দ্রমণি দেবী তাঁ'র মাতা।

বাল্যে রামকৃষ্ণ দেবকে সকলে ডাক্‌ত গদাই বা গদাধর ব'লে। তাঁ'র ভাল নাম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছোট বেলা হ'তেই তিনি দেখ্‌তে খুব সুন্দর ছিলেন এবং গান বড় ভালবাসতেন। লেখাপড়া কর্‌বার ইচ্ছা তাঁ'র আদৌ ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, আকাট মূর্খ হ'লে খাবে কি? অবস্থাও ত তেমন ভাল নয়। গদাধর ভাব্‌লেন লেখাপড়া দিয়েই বা হ'বে কি—কামিনী-কাঞ্চন দিয়েই বা হ'বে কি? তাঁ'রা ছিলেন তিন ভাই। বড় ভাই পণ্ডিত রামকুমার দেখ্‌লেন সংসার হ'য়ে আস্‌ছে অচল; তিনি কল্‌কাতায় ঠন্‌ঠনে কালী-মন্দিরের কাছে ঝামাপুকুরে কর্‌লেন এক টোল। গদাই ত দেশে থাক্‌লে একেবারে অধঃপাতে যা'বে, টোলে আর পাঁচটী ছেলের দেখা দেখি যদি কিছু হয় এই ভেবে তাঁ'র দাদা তাঁ'কে নিয়ে এলেন সঙ্গে ক'রে। কিন্তু গদাধর টোলেও কিছু কর্‌লেন না। দাদা রামকুমার ঠাকুর মশাই প্রত্যহ যজমানের কায আর টোলে ছাত্র পড়ানতে অত্যন্ত পরিশ্রম বোধ ক'রে গদাধরকে অগত্যা পূজো শেখালেন। পূজো তিনি বড় ভালবাস্‌তেন কাযেই আনন্দের সঙ্গে রাজি হ'লেন।

ঘটনাক্রমে, এই সময়ে কল্‌কাতা জানবাজারের রাণী রাসমণি কল্‌কাতার দু'মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় ৯ লাখ্‌ টাকা খরচ ক'রে তৈয়ারী করালেন এক বিরাট কালী মন্দির। গদাধরের দাদা নিলেন ঐ

মন্দিরের পূজোর ভার। ১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নান-যাত্রার দিন হ'ল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। গদাধর সেইদিন প্রথম এলেন দক্ষিণেশ্বরে। রাণী মা আর তাঁ'র জামাই মথুর-বাবু তাঁ'কে দেখে ভারী খুসী হ'লেন। কয়েক মাস বিষ্ণুর মন্দিরে কর্‌লেন পূজো; তাঁ'র দাদা কর্‌লেন আর সব পূজো। তারপর গদাধর মা ভবতারিণীর পূজোর ভার নিলেন। এদিকে তাঁ'র দাদাও মারা গেলেন। রামকৃষ্ণর পাঁচ টাকা মাইনে বরাদ্ধ হ'ল। তিনি সব ঠাকুরের পূজোর ভার নিলেন।

মার উপর ছিল তাঁ'র অগাধ ভক্তি। মা বল্‌লেন, "গদাধর, তুই বিয়ে কর।" তিনি মার অবাধ্য হলেন না। কামারপুকুরের তু'ক্রোশ দূরে জয়রাম বাটির শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের ছ' বছরের মেয়ে শ্রীমতী সারদা দেবীর সঙ্গে হ'ল তাঁ'র বিয়ে, ১২৬৫ সালে।

শ্রীমতী সারদা দেবীও বড়ই ধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন। স্বামীর মত হ'ল স্ত্রী। তু'জনেরই বিষয়ে দারুণ বৈরাগ্য—কেউ কিছু চান্ না এ সংসারের। একদিন সারদামণি দেবীকে কিছু অর্থ দান কর্‌তে বড্ড ইচ্ছা হ'ল রাণী রাসমণির জামাতা মথুর-বাবুর। তিনি বল্‌লেন, "আমার বড়ই ইচ্ছা যে আপনাকে কিছু দিই, আপনি বলুন, আপনার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন।"

শ্রীমতী সারদামণি হেসে বল্‌লেন, "আমার ত বাবা কিছুরই অভাব নেই—তবে যদি নিতেই বল—নিলেই যদি তুমি বাবা খুসী হও, তা'হলে আমাকে ভাল দেখে তু'পসার দোক্তার পাতা এনে দাও" কথা শুনে সকলে ত অবাক্।

এদিকে ভবতারিণী দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ একে একে আরম্ভ ক'রে দিলেন পৃথিবীর সব ধর্ম্মের সাধনা। তিনি সব সাধনার

চরম স্থলে পৌঁছে বুঝ্‌লেন সবারই এক কথা। ও সব হ'চ্ছে এক এক পথে ভগবানের কাছে যা'বার রাস্তা মাত্র। পর্ব্বত হ'তে বেরিয়ে নদী যেমন ছুটে নানা দিগ্‌দেশ ঘুরে মেশে সমুদ্রে, তেমনি আল্লা, গড, জিহোভা, জোভ্‌, শক্তি, বিষ্ণু, গণপতি, সূর্য্য, শিব সবাই এক—রামকৃষ্ণের এই বিচিত্র সাধনার কথা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়্‌ল। রামকৃষ্ণ সিদ্ধ হয়েছেন—ভগবানকে দেখেছেন, এ কথা অচিরে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হ'য়ে পড়্‌ল। তাঁ'র দৈনন্দিন কথা-বার্ত্তায়, চলা-ফেরায় সকলেই টের পেলেন, তিনি যে-সে লোক নন্—নিশ্চয় মহাপুরুষ।

প্রথমে কল্‌কাতার জন-কয়েক লোক হ'য়ে পড়্‌লেন তাঁ'র বিশিষ্ট ভক্ত। তাঁ'রা বাড়ী-ঘর ছেড়ে এসে পড়ে রইলেন তাঁ'র কাছে। তাঁ'দের মধ্যে—প্রধানটিরই নাম বিবেকানন্দ। বাড়ী ছিল কল্‌কাতার সিমলায় এবং তাঁ'র নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, অসাধারণ বাগ্মী ও নববিধান প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃতকার "শ্রীম" বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয় এবং রাখাল মহারাজ বা ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রভৃতি ভুবনবরেণ্য ব্যক্তিগণ তাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌লেন। দলে দলে তাঁ'র শিষ্য হ'ল। তাঁ'র সর্ব্ব-হৃদয়গ্রাহী উপমাময় উপদেশে নরনারী মেতে উঠ্‌ল। ছোট ছোট কথা দিয়ে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের দুরূহ-তত্ত্ব জলের মত তরল ক'রে সকলকে একান্ত বিস্মিত ক'রে তুল্‌লেন। কল্‌কাতার কাশীপুরের এক বাগানে বাংলা ১২৯৩ সালে ক্যান্‌সার রোগে তিনি দেহ রক্ষা করেছেন।

তাঁ'র ভক্ত—অসংখ্য সংসার ত্যাগী সাধু আজ তাঁ'দের গুরুর বিজয় বৈজয়ন্তী সারা পৃথিবীতে উড়াচ্ছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁ'র কথা প্রচারিত হয়নি। এ প্রচারের মূলে ছিলেন, মহাভক্ত ও মহাবাগ্মী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁ'রই চেষ্টায় রামকৃষ্ণ দেবের ছবি, তাঁ'র কথা নিয়ে নানা ভাষায় অসংখ্য বই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—ভারতের চারদিকে—বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে আজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কীর্ত্তি-মণ্ডিত বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে, আমেরিকায়, চিকাগোতে, ইউরোপে—পৃথিবীর সব বড় বড় সহরে রামকৃষ্ণ মিশন ব্যথিতের ও আর্ত্তের সেবায় যে যুগান্তর এনেছে তা'র তুলনা নাই। তাঁ'র উল্লেখ-যোগ্য প্রধান উপদেশ হ'চ্ছে—সব ধর্ম্ম এক, সব ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মমত নিয়ে ঝগড়া করা উচিত নয়, গোঁড়ামী ভাল নয়। মানুষ হ'য়ে মানুষকে কর্‌তে নেই ঘৃণা, সবাইকে বাস্‌বে ভাল। দীন, দুঃখী, অনাথ, আতুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সবারই মধ্যে আছেন একই ভগবান্। মানুষকে সেবা কর্‌বে, কষ্ট দূর কর্‌বার জন্য কর্‌বে জীবনোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ বল্‌তেন, "কাঁচা ময়দা গরম ঘিয়ে ফেলে দিলে কল্‌কল্ ক'রে হয় শব্দ, কিন্তু যতই ময়দা ভাজা হ'তে থাকে ততই তা'র শব্দ আসে কমে। ভাজা যেমন হ'লে আর শব্দ হয় না তেমনি অল্প জ্ঞান পেলে মানুষ লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে, বাহ্য আড়ম্বর দেখায়, পূর্ণ জ্ঞানী হ'লে আর সে সব থাকে না।"

(২) **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** সি, আই, ই

বাংলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে ভুল্‌তে বসেছেন, কিন্তু তাঁ'র মন্ত্র "বন্দে মাতরম্"কে ভুলা কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে মন্ত্র ভুল্‌বার

নয়—সহস্র চেষ্টায়ও বুঝি তা' ভুলানো যা'বে না বাঙ্গালীর মর্ম্মের মন্ত্র সে, মায়ের কথা ভুল্‌বে সন্তান ?

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, "নাদ ব্রহ্ম ঃ"— শব্দই ভগবান্‌। কথাটার একবর্ণও মিথ্যে নয়। যতক্ষণ মানুষ কথা কয় ততক্ষণই তা'র জীবন আছে ব'লে মনে হয়—কথা বন্ধ হ'লে—বাক্‌রোধ হ'লে সে হ'য়ে যায় মরা আর না হয় মৌনী—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। কথা গুছিয়ে বল্‌লে তা'র নাম হয় ভাষা। বাংলা ভাষা, যা'র আজ এত প্রভাব, কিছুদিন আগে তা'র এমন অবস্থা ছিল যে গুছিয়ে বলা বা লেখা চল্‌ত না। আড়ষ্ট ভাব, জড়তায় জড়িত ছিল সে ভাষা।
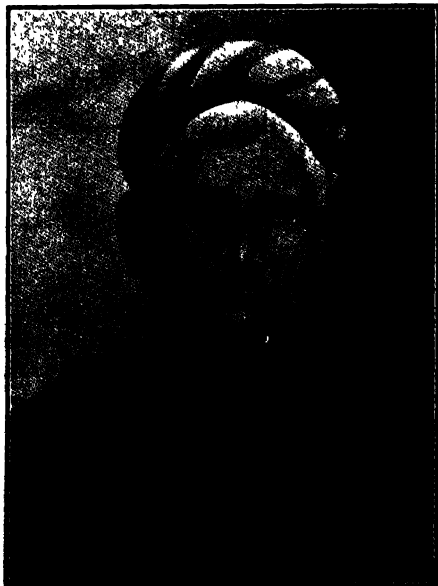
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার এই দুর্গতি দেখে হয় ত ভগবান্‌ ব্যাকুল হ'লেন। তা'ই, পাঠালেন রাজা রাম মোহনকে—তা'রপর বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদন-মোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ মনস্বিগণকে। তাঁ'রা ঢেলে সাজ্‌লেন বাংলা ভাষাকে, গড়ে দিলেন তা'র বল্‌বার ও লিখ্‌বার আইন কানুন—ব্যাকরণ। কিন্তু তথাপি জননী সংস্কৃত—জননী পালির

সংস্রব ছেড়ে উঠা হ'ল দায়। ভাষার এই দৈন্য, এই গ্লানি, এই পঙ্গুত্ব দূর করতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সার্থক তাঁ'র নাম! ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন রাত্রি ৯ টার সময় চব্বিশ পরগণার নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁঠাল পাড়ায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ আলোকিত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ডেপুটি কলেক্টার যাদবচন্দ্র ছেলের পড়া-শুনার সুবন্দোবস্ত করলেন। কল্‌কাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হ'ল ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বৎসরই প্রথম বি, এ পাশ্ করলেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে তিনি হ'লেন "বি, এ বঙ্কিম"। গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট তাঁ'কে অবিলম্বে করলেন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কিছুদিন পরে অসামান্য গুণগ্রামে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে "রায় বাহাদুর", "সি, আই, ই" প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে করলেন অলঙ্কৃত! তিনি ৩৩ বৎসর চাকরী ক'রে ১৮৯১ সালে নিয়েছিলেন পেন্সন। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা'র ফল-স্বরূপ বাঙ্গালীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন অজস্র মণি-মাণিক্য। যা'দের তুলনা নেই—কখনও হবে কি না, কে জানে?

পনর বৎসর বয়সের সময় তিনি রচনা করেন তাঁ'র কবিতার বই ললিতা ও মানস এবং ছাব্বিশ বছরে দুর্গেশনন্দিনী। এ সময় যেন বাংলা-ভাষায় জোয়ার বইল। বিদ্যাসাগর, তর্কলঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়গণ বাজাচ্ছিলেন শঙ্খ ঘণ্টা—বাজিয়ে বাজিয়ে করছিলেন বাগ্‌দেবীর আরাধনা। এইবার বঙ্কিমচন্দ্র সুমধুর বীণা বাজা'তে সুরু করলেন। বাংলা-ভাষার এক নূতন যুগ এল। তিনি লিখ্‌লেন কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল—তা'রপর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম,

রাজসিংহ, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভায় দেশবাসী একান্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচির পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল। এ সময়ে দেখা দিল তাঁ'র অদ্ভুত সমালোচনা গ্রন্থ কৃষ্ণ চরিত্র। বহির্মুখ জনগণকে তিনি কর্‌লেন অন্তর্মুখী। যা' ভাব্‌তেন না তাঁ'রা এখন থেকে তা' ভাব্‌তে হ'বে তাঁ'দের। বঙ্গ-সমাজের কর্‌লেন তিনি মহোপকার।

নানা ধর্ম্মতত্ত্বে গীতা ব্যাখ্যা ক'রে, অনুশীলন তত্ত্ব স্থাপন ক'রে, বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রের মারফৎ নানা প্রবন্ধ লিখে তিনি যুগান্তর আন্‌লেন। এদিকে আনন্দমঠ পাঠ ক'রে, তা'র অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লেন একদল বাঙ্গালী। আর্ত্তের ত্রাণ, দুষ্টের দমন প্রভৃতিতে তাঁ'দের একান্ত মনোযোগ দেখা দিল।

সেইদিন হ'তে আজ অবধি মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের ভাবধারা—তাঁ'দের মুখোচ্চারিত অমৃতনির্ঝর সঙ্গীত—দেশ মাতৃকার বন্দনা-গীতি "বন্দেমাতরম্" বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে এক তুমুল তুফান তুলেছে। কী অদ্ভুত সে সঙ্গীতের শক্তি—কী অদ্ভুত তা'র প্রেরণা!

এমন মন্ত্রের যিনি ঋষি তাঁ'র নশ্বর দেহ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল অন্তর্হিত হ'লেও তিনি বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদগাতা ঋষিরূপে যে অমর হ'য়ে রয়েছেন তা'তে কোনই সন্দেহ নেই।

(৩) **শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়** এফ. আর. জি. এস (লণ্ডন)

মাতাপিতা নাম রেখেছিলেন শশিভূষণ। দেবাদিদেব শিবের ন্যায়ই ছিল সে ছেলেটীর স্বভাব-চরিত্র। অসামান্য সাধনায় তিনি দেবাদিদেবের মতই নর মধ্যে হয়েছিলেন নরোত্তম।

১২৪৮ সালের ২৪শে ভাদ্র শুক্রবার হুগলী জেলার কোন্নগরের কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁ'র সহধর্ম্মিনী মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর ক্রোড় আলোকিত ক'রে জন্মেছিলেন এই বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ধুরন্ধর শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সততাই ব্যবসায়ের প্রাণ। এই বাঙ্গালী ব্যবসায়ী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুকুমার শৈশবাবধি এমনই আবেষ্টনীতে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন যে তিনি সততাকেই তাঁ'র ব্যবসায়ের 'প্রাণ' ব'লে সর্ব্বতোভাবে অভ্যাস কর্‌তে শিখেছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে—সাধু ও সচ্চরিত্র বংশে জন্মে, অজস্র অভাব ও অভিযোগের মধ্যে বড় হ'য়ে তাঁ'র স্বভাব এমনই সুমার্জ্জিত ও ধর্ম্মময় হ'য়েছিল যে তিনি উন্মার্গ-গামী হ'তে—ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হ'তে সর্ব্বদা অবহিত থাক্‌তেন।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ছোট বেলায় বাজি রেখে লটারীতে জিতে তিনি সে কথা তাঁ'র মা মোক্ষদা দেবীকে বল্‌লে সেই যে তিনি তাঁ'কে বলেছিলেন, "না বাবা, কখনও অধর্ম্ম পথে যেও না; অসৎ পথে বড় হওয়া যায় না। সততা,

সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তাই হ'চ্ছে, ভাল হবার, বড় হবার উপায়"—সে বাণী তিনি সুদীর্ঘ জীবনে—এক পলের জন্যও বিস্মৃত হননি। সে মাতৃ-বাক্য হ'য়ে উঠেছিল তাঁ'র জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি এই মন্ত্র-প্রভাবেই হ'য়ে উঠেছিলেন এত বড়, এত ধনের অধিকারী, বব্যসায়ী সমাজে এত প্রতিষ্ঠাবান্। সদ্ভাব, সাধু ইচ্ছা নিয়ে, একনিষ্ঠ হ'য়ে কোন ব্যবসায়—কোন চেষ্টায় অগ্রসর হ'লে ভগবান্ তাঁ'র সহায় হন।

বালক শশিভূষণের একান্ত ইচ্ছা ভাল হবেন—বড় হবেন। ভগবান্ এনে দিলেন তাঁ'র সাম্‌নে অপূর্ব্ব সুযোগ। তাঁ'র জয়-জয়কারে দেশ হ'য়ে উঠ্‌ল মুখরিত। চতুর্দ্দশ বর্ষীয় শশিভূষণ লিখ্‌লেন—"ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।" বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় এই বই অজস্র বিক্রীত হ'ল। এবার শশিভূষণ চেষ্টা কর্‌লেন সাহিত্য-গ্রন্থ লিখ্‌তে। তিনি লিখ্‌লেন, অপূর্ব্ব গ্রন্থ "রামের রাজ্যাভিষেক"। তিনি পরমোৎসাহে আবার লিখ্‌লেন, "ভূগোল-পরিচয়"—এখনও যাঁ'র অজস্র সংস্করণ—অফুরন্ত কাট্‌তি চল্‌ছে।

এই ভূগোল-পরিচয় প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেধাবী, তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন শশিভূষণ ভূগোল পাঠে মানচিত্রের একান্ত ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার কথা হৃদয়ঙ্গম কর্‌লেন। শৈশবকাল হ'তেই চিত্রাঙ্কণে তাঁ'র নৈপুণ্য ছিল। তিনি মানচিত্র অঙ্কণে রত হলেন। বিধাতা তাঁ'কে জোগালেন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। তিনিও সুবিজ্ঞ ব্যবসায়ীর মত গ্রন্থের বাজার লক্ষ্য কর্‌লেন। মানচিত্র মুদ্রণের আয়োজন হ'ল। ক্রমে ভূগোলক ও চার্ট হ'ল। মানচিত্রের রাজ্যে তাঁ'র মানচিত্র যুগান্তর উপস্থিত কর্‌ল। ইংরেজী, বাংলা, উর্দ্দু,

হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা রংয়ের মানচিত্র এবং তাঁ'র স্বরচিত গ্রন্থগুলো এনে দিতে লাগ্‌ল অজস্র অর্থ। শশিভূষণের দিন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল।

ক্রাউচ্ লেনে শশিভূষণের বাসা—ভাড়াটে বাড়ীতে প্রেস—শত শত অর্ডার—নিজে সব দেখাশুনা কর্‌ছেন। ক্লান্তি বা ক্রোধ নেই তাঁ'র—সার্থক তাঁ'র নাম। তিনি শিব ঠাকুরের মতই সব সইছেন—অসামান্য তাঁ'র সইবার ক্ষমতা—অসম্ভব তাঁ'র অধ্যবসায়—এ না হ'লে কে কবে ব্যবসায়ে বড় হ'তে পেরেছেন?

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে জিনিষ-পত্রেব দাম খুব বেশী বর্দ্ধিত হ'লেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ী শশিভূষণ অকুণ্ঠিতভাবে তাঁ'র ম্যানেজারকে বলেছিলেন, "ম্যাপের দর বাড়ানো হ'বে না। কারণ তা'হলে দেশের লোক মানচিত্র কিন্‌তে পার্‌বে না।"

ব্যবসায়ে বঙ্গ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁ'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভের মূলে ছিল অক্লান্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি ও সাধুতা। শাস্ত্রবাক্যের মত কেবল বল্‌লে চল্‌বে না—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা কর্‌তে হ'লে, চাই—দৃঢ় নিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ও সততা।

ব্যবসায়-জগতে অসামান্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় ক'রে কৃতী, অসামান্য সৌভাগ্যবান্ শশিভূষণ ১৩৩৩ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ তাঁ'র লীলা-সংবরণ করেছেন।

তিনি রেখে গেছেন—অজস্র গ্রন্থ—অসংখ্য মানচিত্র—অফুরন্ত কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তিই তাঁ'কে রাখ্‌বে সজীব ক'রে। তাঁ'র ব্যবসায় প্রণালী অনুসরণ কর্‌লে বাঙ্গালী মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে, দেশ উজ্জ্বল হ'বে।

(৪) রায় **রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়** বাহাদুর

বাংলা ১২৫৫ সালের ৭ই ভাদ্র নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর নামে পল্লী-ভবনে রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ইর জন্ম হয়। রাধিকাপ্রসন্নের পিতা স্বনামধন্য অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় তখনকার যথেষ্ট অর্থপ্রদ নীলকুঠীতে কাজ করতেন। অভিপ্রেত অর্থলোভে রাধিকাপ্রসন্ন নিজের বৈষয়িক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ক'রে তুলেছিলেন। কমলার কৃপা-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মাতা সরস্বতীরও তাঁ'র এবং তাঁ'র বংশধরগণের উপর যুগপৎ অনুগ্রহ-দৃষ্টি হয়েছিল। কৃপণের ন্যায় অনবরত ধন-সঞ্চয় না ক'রে তিনি অর্থের সদ্ব্যবহারেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তাঁ'র দানের অন্ত ছিল না—বহু দরিদ্র, অভাব-নিপীড়িত তাঁ'র মহানুভবতায় কৃতার্থ হয়েছিল। বহু প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হ'ত তাঁ'র সাহায্যে।

আশৈশব তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সের সময় তিনি তাঁ'র সময়কার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-পরীক্ষা সিনিয়ার স্কলারসিপে সমস্ত কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বৃত্তি ও পুরস্কারাদি লাভ করেন। সে সময়ে তাঁ'র সম-পরীক্ষার্থী ছিলেন—যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন—সেই স্বনাম-ধন্য স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ও বাণীর বরপুত্র, প্রতিভার অবতার, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের নব-যুগের প্রবর্ত্তক রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই।

রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন এমন কর্ম্ম—যা'র মত মহৎ ও উদার কায নেই বললেই হয়। তিনি সারা জীবন সেই অবদানময়, মহৎ কর্ম্মে—শিক্ষা-প্রচার

কার্য্যে আত্মনিয়োগ ক'রে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শিক্ষার পথ সুগম ক'রে গেছেন। একাদিক্রমে চৌদ্দ বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী সার্কেলের বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শকের কায ক'রে নানাভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। তাঁ'র অক্লান্ত চেষ্টায় দেশময় শিক্ষার এক নব-যুগের নব-ভাবের প্রবর্ত্তন হয়েছিল। বাঙ্গালীর ভুল্‌লে চল্‌বে না সে দান। তিনি মাতৃ-ভাষার সাহায্যে নব্য-তন্ত্রের শিক্ষা বিস্তারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নিজে হাতে কলমে সে চেষ্টা ক'রে—উন্নতিময় ইংরেজী-সাহিত্য হ'তে উপকরণ আহরণ ক'রে বাংলা ভাষায় নানা উপাদেয় পাঠ্য-গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে শিক্ষার্থিগণের পরম কল্যাণ সাধন হয়েছে।
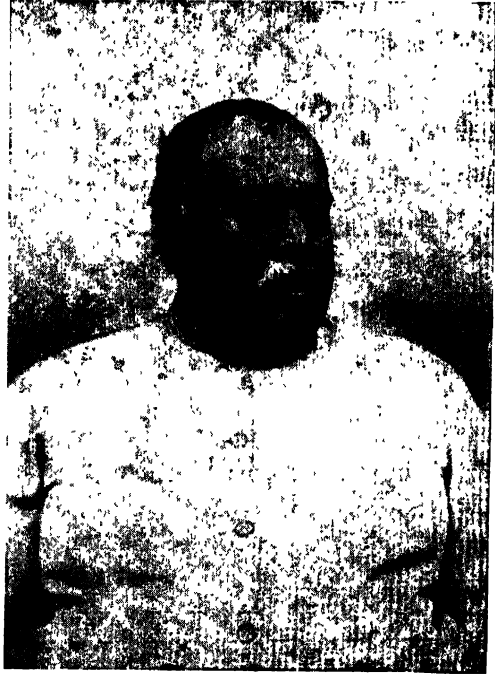
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

শিশুরাই ভবিষ্যতে গড়ে তুল্‌বে দেশ এই ধারণায় তিনি সেই

ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মনঃ-সংগঠনের জন্য লিখেছিলেন "স্বাস্থ্যরক্ষা" ও "প্রাকৃতিক ভূগোল"। শিক্ষা-বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রে, প্রতিষ্ঠানে, ক্ষেত্রে তিনি দিক্পালের ন্যায় বিচরণ করতেন। প্রায় বা'র বৎসর তিনি সম-সুখ্যাতির সঙ্গে ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন্ সার্ভিসের মেম্বার বা সদস্য-পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে বহুবিধ শিক্ষোন্নতিকর কার্য্য সম্পাদন ক'রে দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটীর সম্পাদক ও সদস্যরূপে তাঁ'র কৃতিত্বের অবধি ছিল না। এ সব ছাড়া তিনি আরও ছিলেন "বোর্ড অফ্ ভিজিটার্স" এবং শিবপুর সিভিল ইঞ্জীনিয়ারীং প্রভৃতি নানা মহৎ অনুষ্ঠানের সদস্য।

অনেকেই হয় ত জানেন যে সে সময়ে "Useful Literature Society" ব'লে একটী বিখ্যাত ও বহু উপকারজনক সোসাইটী ছিল। তিনি সেই সোসাইটীর সভ্যরূপে আজীবন শিক্ষা প্রচারে প্রভূত সহায়তা ক'রে গেছেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোন অনুষ্ঠানের তিনি পরম-সহায়ক ছিলেন। ১৮৮৬ সালে যখন এদেশে Net Grant Committee গঠিত হয়, তখন রাধিকাপ্রসন্ন সেই কমিটীরও বিশিষ্ট সদস্য পদে বৃত হন। পর বৎসর বিদ্যালয়গুলির সরকারী সাহায্যদান কল্পে যে সমস্ত নিয়ম গঠিত ও সংশোধিত হ'য়ে কার্য্যকরী হয় এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারের জন্য যে পরামর্শ সভার সৃষ্টি হয়, তিনি তা'র সদস্য ও সম্পাদক হন। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা-দেশে বাংলা-ভাষার শিক্ষা বিস্তারের স্কীম্ সংশোধনের জন্য একটী সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই সভারও সদস্য এবং সম্পাদক হন। এই উপলক্ষে তাঁ'র অক্লান্ত চেষ্টায় নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ

প্রাইমারী এবং মধ্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বর্দ্ধিত হ'য়ে নানাভাবে নানা উন্নতি হয়।

শিক্ষা-বিভাগীয় যে কোন মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁ'র প্রাণের একান্ত যোগ ছিল। আজীবন তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষার সকল রকম প্রতিষ্ঠানের সকল কাযে আত্মনিয়োগ কর্‌তেন। তাঁ'র সময়ের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ হেনরী উড্‌রো এম্, এ সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হ'লে রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরই তা'র অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। অভিলষিত অর্থ সংগ্রহ ক'রে তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরে উড্‌রো সাহেবের মর্ম্মর নির্ম্মিত অর্দ্ধ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ হ'তে "উড্‌রো বৃত্তি" নামে একটী বৃত্তি স্থাপন করেন। তারপর অপর অধ্যক্ষ চার্ল্‌স্ এইচ্, টনি এম্, এ., সি, আই, ই সাহেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁ'র আবক্ষ মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি গড়ে উঠেছে, তাঁ'রই একান্ত চেষ্টার ফলে। টনি মেমোরিয়াল প্রাইজ্‌ও তাঁ'রই চেষ্টার সুফল।

সরকারী নানা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত ছিলেন। বঙ্গের বিজ্ঞান বিশারদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভা "Indian Association for the Cultivation of Science"এর তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের সাহায্য, মৃত্যুর পর নিরাশ্রয়দের সাহায্য প্রভৃতি মহৎ অনুষ্ঠানের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটীর নাম হয়েছে "হিন্দু এম্যুইটী ফাণ্ড্" ; রায় বাহাদুর ছিলেন তা'র ডিরেক্‌টার।

মাতৃভূমি গোঁসাই দুর্গাপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি তা'র সাহায্যের জন্য এককালীন্ দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়ক হ'য়ে তাঁ'র নিজের জেলা নদীয়ার নানা জায়গায় স্ত্রী শিক্ষার সুপ্রসার জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন।

তাঁ'র প্রণীত "স্বাস্থ্য-রক্ষা" প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। এর পাঁচ বছর পরে ১৮৬৮ সালে তিনি "ভূ-বিদ্যা বা প্রাকৃতিক ভূগোল" প্রণয়ণ করেন। "Notes on Hindu" গ্রন্থে বিহারের আদালতে আদালতে পার্শী ভাষার পরিবর্ত্তে কায়েথী ভাষার প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দান করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তা'রপর রিপোর্টস্ অফ্ দি ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশনের ক্রোড়পত্রের ন্যায় বের হয় সরকারী পত্রিকা।

১৮৮২ হ'তে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণ শিক্ষা স্তম্ভে বার্ষিক সাধারণ বিবরণী রচনা ক'রে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। গুণগ্রাহী ভারত-সরকার তাঁ'র এত পরিশ্রম ও নানা সদ্গুণের জন্য একান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'কে ১৮৮৭ সালে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে অলঙ্কৃত করেন। ভারত-সচিব মহোদয় নিজে তাঁ'র গুণগ্রামে মুগ্ধ হ'য়ে, একটী বিশেষ সভার অনুষ্ঠান ক'রে, মুক্তকণ্ঠে তাঁ'র প্রশংসা করেছিলেন এবং ১৯০১ সালে সি, আই, ই উপাধি দিয়ে তাঁ'কে সম্মানিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভাইস্-চ্যানসেলার টমাস্ র‍্যালে সমাবর্ত্তন-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাঁ'র বহুমুখী প্রতিভার অজস্র প্রশংসা করতে করতে বলেছিলেন, "দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্নের অক্লান্ত পরিশ্রমের তুলনা নেই।"

অনেকদিন নানা যশের সঙ্গে দেশের লোকের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে, অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে, ১৯০৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৩০৯ সালের ১০ই ফাল্গুন) এই মহাপ্রাণ, মহাপুরুষ ইহধাম হ'তে তিরোহিত হয়েছেন। তাঁ'র স্থান আর পূর্ণ হ'বে কিনা কে জানে ?

(৫) স্যার **রাসবিহারী ঘোষ**

গ্রাম থেকেই গড়ে ওঠে সহর। সহর থেকেই বিকশিত হয় যত দেশের সৌরভময় কুসুম-সদৃশ অসামান্য গুণজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। যাঁ'র কথা বল্‌তে যাচ্ছি, বাংলার সেই সোনার ছেলে, স্যার রাসবিহারীর জন্ম হ'য়েছিল বাংলা-দেশের বর্দ্ধমান জেলার এক অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীতে—নাম তা'র তোড়কোণা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রাসবিহারীর জন্ম হয়। তাঁ'র বাবা কর্‌তেন বর্দ্ধমানে সামান্য এক রাজকর্ম্ম, মাহিনা ছিল খুব কম; তাঁ'র অবস্থা তত ভাল ছিল না সুতরাং ছেলেকে সহরে রেখে ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখাবার উপায় ছিল না। রাসবিহারীর বাল্যশিক্ষা সুরু হ'ল গ্রাম্য পাঠশালায়।

প্রতিভা লুকিয়ে থাক্‌বার বস্তু নয়। ছোট্ট ছেলেটী যেন প্রতিভা-বিদ্যুতে পরিপূর্ণ—নিতান্ত চঞ্চল, রাত দিন খেলা নিয়েই আছে—কিন্তু কা'রও বল্‌বার উপায় নেই কিছু—বুদ্ধিতে ভরা সব কথা—বালক বড় হ'তে না হ'তেই তা'র অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয়ে সকলে বিস্মিত হ'য়ে গেল। ধাপে ধাপে উঠে, যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে (সেকেণ্ড ক্লাসে) উঠ্‌লেন তখন হ'তে সহসা তাঁ'র আভ্যন্তরীণ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় সহস্রাংশুর অংশুজালের মত

বিদ্যালয় আলোকিত ক'রে তুল্‌ল। রাসু—সেই দুষ্টু রাসু আর তেমন নেই। সুতীক্ষ্ণ তাঁ'র বুদ্ধি—অদ্ভুত তাঁ'র স্মৃতিশক্তি। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু কি হ'ল কে জানে—ফল তেমন ভাল হ'ল না।

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় রাসবিহারী দু'বছর কাটা'লেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৮৬২ সালে এফ, এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকার কর্‌লেন; ১৮৬৬ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম্, এ পরীক্ষায় তিনি হলেন প্রথম। তিনি অনেক বই প'ড়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় কর্‌লেন।

১৮৬৭ সালে আইন পরীক্ষায় তিনি প্রথম হ'য়ে সোনার মেডেল লাভ কর্‌লেন। এরপর তিনি যোগ দিলেন হাইকোর্টে; কিন্তু প্রথমে তাঁ'র কোনই সুবিধা হ'ল না। সারা পৃথিবীতে যিনি এককালে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ব'লে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁ'র প্রারম্ভ জীবন এমনই দুর্দ্দশাময় হয়েছিল। কিন্তু ভগবান্ অদ্ভুত উপায়ে তাঁ'কে বড় হবার কৌশল এনে তাঁ'র সাম্‌নে ধর্‌লেন।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়। তাঁ'র সঙ্গে ঘটল রাসবিহারীর পরিচয়—যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ হ'ল। দ্বারকানাথের উৎসাহে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে নিজের ব্যবসায়ে যোগদান কর্‌লেন। ১৮৭১ সালে তিনি "অনার্স ইন্ ল" নামে দুরূহ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হলেন। তারপর "ঠাকুর ল লেক্‌চারার" হ'য়ে "ভারতে বন্দকী আইন" সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে থাক্‌লেন। এই গ্রন্থ এখনও সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

শুভ সময় এল। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ ঘুচে গেল। দু'জনে সমভাবে কৃপা বিতরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন রাসবিহারীকে। আইন-

ব্যবসায়ে অসামান্য প্রতিপত্তির সঙ্গে অজস্র অর্থ আস্‌তে থাক্‌ল। বিচারপতিগণ ও সমব্যবসায়িগণ তাঁ'র অকাট্য যুক্তি, অগাধ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তাঁ'র অসামান্য যশে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তিনি ১৮৭৭ সালে হলেন আইনের পরীক্ষক, ১৮৭৯ সালে হলেন ফেলো, ১৮৮৪ সালে পেলেন 'ডক্টর অফ ল' উপাধি, তারপর হলেন সিণ্ডিকেটের সদস্য। আইনে তাঁ'র অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌ল। তিনি কেবলমাত্র আইনে বদ্ধ না থেকে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব গ্রহণ কর্‌লেন। ১৮৯১ সালে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। এই সভার বক্তৃতায় সকলে তাঁ'র অসামান্য প্রতিভায় একান্ত বিস্মিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ১৮৯৬ সালে তিনি "সি, আই, ই" উপাধি পেলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁ'র গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'র পরামর্শ না নিয়ে কোন নূতন আইন প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তনাদি কর্‌তেন না; ১৯০৮ সালে পুনর্গঠিত দেওয়ানী কার্য্যবিধি তাঁ'রই রচিত। বঙ্গ ভঙ্গের সময় তাঁ'র প্রতিবাদও কম বিস্ময়কর নয়। দেশবাসী তাঁ'কে দু' দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য স্যার রাসবিহারীর দান-যজ্ঞ অতুলনীয়। বেলগাছিয়ার মেডিক্যাল্‌ কলেজ, ন্যাশনাল্‌ কাউনসিল্‌ অফ এডুকেশন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি বহু দান করেছিলেন। এক কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি দিয়ে গেছেন একুশ লাখ টাকা। সুবিখ্যাত সায়েন্‌স কলেজ তাঁ'র নাম চিরকাল ঘোষণা করবে। মুগ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁ'কে "ডক্‌টর অফ ফিলসফী" উপাধি ভূষণে অলঙ্কৃত করেন; গভর্ণমেণ্ট "নাইট" উপাধি দান করেন।

তাঁহার তুল্য স্মরণ-শক্তিশালী ব্যবহারাজীব ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। পক্ষ সমর্থনকালে তিনি নজীর দেখাতে পুস্তকের পত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত মুখে মুখে ব'লে দিতেন। ইংরেজ গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হ'তে অনর্গল প্রাসঙ্গিক বচন উদ্ধৃত কর্‌তেন।

নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায়, তেজস্বিতায়, দেশ ভক্তিতে, দানশীলতায় স্যার রাসবিহারী ঘোষ সত্য সত্যই সোনার বাংলার সোনার ছেলে ছিলেন। খুব কম দেশেই তেমন ছেলে জন্মে। তিনি ১৩২৭ সালের ১৫ই ফাল্গুন চলে গেছেন।

(৬) ডাক্তার **মহেন্দ্রলাল সরকার**

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কথা আজকাল অনেকেই হয় ত তত ভাল জানেন না। দরিদ্র-গৃহে জন্মে তাঁ'র উন্নতি লাভ করার কথা যখনই মনে ওঠে তখনই মহা আশ্বাস ও ভরসার সঞ্চার হয়। সে সময় মনে হয় যে বাংলা-দেশে এমন সন্তানও একদিন জন্মেছিলেন যাঁ'র গৌরব ও প্রতিভার দীপ্তি মোটেই দরিদ্রতা ম্লান কর্‌তে পারে নি। মহেন্দ্রলাল ১৮৩৩ সালের ২রা নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্ণের পরীক্ষা হয় অগ্নিদাহে ; যখন মহেন্দ্রলালের বয়স মাত্র চার বছর তখন তাঁ'র পিতা তাঁ'দের অবস্থা আরও শোচনীয় ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেন। দিন আর চলে না দেখে অগত্যা মা তাঁ'কে নিয়ে তাঁ'র মামার বাড়ীতে এলেন। তাঁ'র দুই মামা ছিলেন, তাঁদের অবস্থাও ভাল ছিল না। বড়টীর হৃদয় গল্‌ল না—ছোটটী তবুও ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দিলেন আশ্রয়। মাথা গুজ্‌বার স্থান হ'ল বটে কিন্তু দু' বেলার আহার যোটে না। শোবার বা বস্‌বারও জায়গা নেই—

অতি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, মামার ছেলে পিলেরই সঙ্কুলন হয় না। মাতুলের গরুর জন্য মাথায় ক'রে মাঠ হ'তে বিচালি বয়ে এনে, নানা ফরমাস্ শুনে বালক মহেন্দ্রলাল অতিকষ্টে কখনও পান্তা ভাত কখনও বা ভুক্তাবশিষ্ট খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাগ্‌লেন। এছাড়া আর যে উপায় ছিল না!

শুনা যায় মহেন্দ্রলাল যখন বড় হ'য়ে বিয়ে ক'রে প্রথম শ্বশুর বাড়ী গেলেন, তখন শ্বাশুড়ী ঠাকুরুন নানা আয়োজন ক'রে তাঁ'কে দিলেন খেতে। মহেন্দ্র লাল সেই সব খাবার দেখে অঝোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। ঐ দেখে সকলে ত অবাক্। এ আবার কি? জামাই খেতে বসে কাঁদ্‌ছে কেন? জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁ'রা শুন্‌লেন—"আপনারা ত আমায় খেতে দিচ্ছেন এত আয়োজন ক'রে, কিন্তু আমার মা যে কত কাল কোন ভাল জিনিষ খেতে পান নি—তা'ই ভেবে আস্‌ছে আমার চোখে জল।"
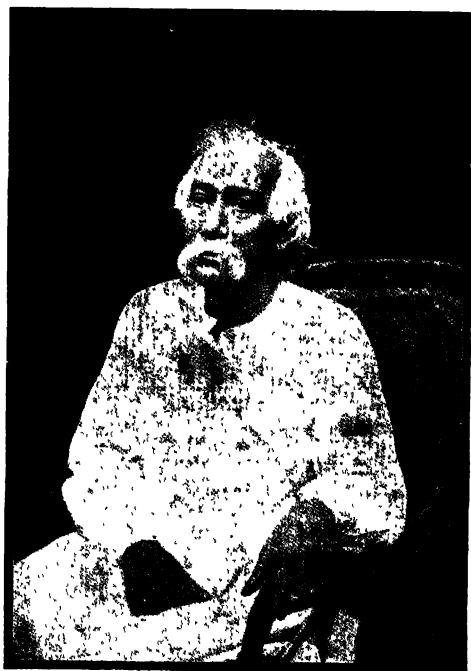
মহেন্দ্রলাল সরকার

এই অবস্থায় মহেন্দ্রলালের দিন কাট্‌ত মাতুলালয়ে। কিন্তু তবুও মহেন্দ্রলাল মাতুলদের দয়ার কথা জীবনে এক দিনের জন্যও ভোলেন নি। বড় হ'য়ে তাঁ'দের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য কর্‌তেন।

মহেন্দ্রলাল কল্‌কাতায় এসে নিজ প্রতিভায় অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হ'লেন হেয়ার স্কুলে। জুনিয়ার, সিনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। তারপর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ ক'রে তাঁ'র অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁ'র আশ্চর্য্য প্রতিভার বহু কথা শুনা যায়, সমপাঠীদের অপেক্ষা অনেক বেশী তিনি জান্‌তেন, এমন কি, অধ্যাপকেরাও যা' জান্‌তেন না তিনি তা' অনায়াসে বলে দিতেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়্‌বার সময় ডাক্তার আর্চ্চার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্রকে চক্ষুরোগ সম্পর্কে একটী প্রশ্ন কর্‌লে সে ক্লাশের সকলে যখন পার্‌লে না তখন ঘটনাক্রমে অন্য কক্ষে দণ্ডায়মান মহেন্দ্রলাল, সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সাহেব ত অবাক! দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র এ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিলে কি ক'রে। সাহেব তাঁ'কে ডেকে কাছে এনে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি এই উত্তর জান্‌লে কি ক'রে।" মহেন্দ্রলাল অতি বিনীতভাবে বল্‌লেন, "স্যার, আমি নিজে নিজে পড়েছি।" সেই হ'তে তাঁ'র কথা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌ল।

আর একবার একজন পরীক্ষক মহেন্দ্রলালের একটী প্রশ্নের উত্তর ভুল মনে ক'রে নম্বর দেননি কিন্তু পরে তাঁ'রই (পরীক্ষকের) ভুল জেনে বিষম লজ্জিত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রলালের পাঠে অনুরক্তির সীমা ছিল না। সকল প্রকার নূতন পুস্তক, পত্রিকা, আবিষ্কার সংবাদ তিনি সংগ্রহ ক'রে পাঠ করতেন—সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের

অহর্নিশ চর্চ্চা কর্‌তেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়া দেশের উন্নতি অসম্ভব ভেবে তিনি বিজ্ঞান সভা স্থাপন করেছিলেন। কত সময় ও অর্থ যে এতে তাঁ'র ব্যয় হ'ত তা'র ঠিক ছিল না। শুধু বিজ্ঞান নয়—সাহিত্যেও তাঁ'র অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মহেন্দ্রলালের বাড়ীর লাইব্রেরী সুবৃহৎ ছিল। সুস্থাবস্থায় রাত্রি ১টা এবং অসুস্থাবস্থায় রাত্রি ১১টা অবধি তাঁ'র পাঠের বিরাম ছিল না। জহুরীর ন্যায় খুঁজ্‌তেন তিনি রত্ন—ডুবুরীর ন্যায় ডুবে তুল্‌তেন মণি-মাণিক্য।

তিনি যেমন অগাধ জ্ঞানী ছিলেন অন্যদিকে তেমনই নির্ভীকতা, পরোপকারিতা, দয়া প্রভৃতি মহদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁ'র উদারতার সীমা ছিল না। তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হ'তে এলোপ্যাথিক্ ডিপ্লোমা নিয়ে বের হয়েছিলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথিকের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এসময় সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও অর্থের অভাব তাঁ'র ছিল না। কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনায় সব যেন বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেল। তাঁ'র অসাধারণ মনস্বিতার কথা স্মরণ ক'রে তখনকার কোন হোমিওপ্যাথ্ তাঁ'কে দেন একখানি হোমিওপ্যাথী পুস্তক সমালোচনা কর্‌তে। তিনি পুস্তকখানি পড়্‌তে পড়্‌তে হোমিওপ্যাথীর বিশেষত্ব সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি ক'রে এক প্রকাশ্য সভায় এলোপ্যাথী অপেক্ষা হোমিওপ্যাথীর সমধিক বৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ ক'রে এক অকাট্য যুক্তিপূর্ণ সার গর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁ'র সহযোগিগণ তাঁ'র উপর এজন্য অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেন ও নানা ভাবে তাঁ'র অপকারে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু কিছুতেই মহেন্দ্রলালের মতের বৈলক্ষণ্য ঘটে না। তিনি দীর্ঘকালের অভ্যস্ত ও প্রভূত অর্থপ্রদ এলোপ্যাথী চিকিৎসা প্রণালী ত্যাগ ক'রে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা

ব্রতে ব্রতী হন। এতে যথেষ্ট নিগ্রহ, অর্থ কৃচ্ছ্রতা ঘট্‌লেও তিনি সে সকলে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

শৈশবে দারিদ্র্যের সঙ্ঘর্ষে মানুষ হ'য়ে দারিদ্র্যের যাতনা তিনি খুব ভাল ভাবেই বুঝ্‌তেন। তিনি নিয়ত সহানুভূতি ও আন্তরিক দয়ায় দরিদ্রের দুঃখ মোচন কর্‌তেন। লোকহিতকর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায় তিনি আজীবন অগ্রণী ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথ-ধামে মহারোগ-গ্রস্তদের জন্য একটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন।

নামকরা, প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক হ'য়েও তাঁ'র হৃদয়ে অপরিসীম ধর্ম্মভাব ছিল। ভগবানের উপর তাঁর অগাধ আস্থা ও ভক্তি ছিল। তাঁ'র রচিত বহু ভক্তি সঙ্গীত অতি সুন্দর। বিজ্ঞান চর্চ্চার মধ্যেও তিনি ভগবৎ প্রেমে জাগ্রত ছিলেন। ১৯০৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী মহেন্দ্রলাল লোকান্তরিত হন।

জ্ঞানে, গুণে, হৃদয়ের মহত্ত্বে এমন সোনার ছেলে বাংলা-দেশে জন্মেছে অতি অল্প। তাঁ'র বউবাজারের বিজ্ঞান-সভা এখনও তাঁ'র সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি ঘোষণা কর্‌ছে। তাঁ'র মধ্য-কল্‌কাতার গৃহ এবং তাঁ'র নামের রাস্তা এখনও তাঁ'কে মনে করিয়ে দেয়। কত বিপন্ন রোগার্ত্ত যে তাঁ'র করুণায় জীবন পেয়েছে তা'র অবধি নেই।

(৭) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশের যখন বড় দুর্দ্দশা—দেশবাসীর মনে যখন বড় বেদনা—সেই সময়ে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হয়েছিল আবির্ভাব। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গোখেল, তিলক প্রভৃতি যুগাবতারগণ জাতির এমনই

অধঃপতনের যুগ-সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন। এক একজনের ছিল এক এক কায। তাঁ'রা নিজেদের পথে জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তন কর্‌বার চেষ্টা ক'রে গেছেন। বজ্রকণ্ঠে আহ্বান ক'রে, ভীরুকে করেছেন সাহসী, অলসকে করেছেন কর্ম্মনিষ্ঠ, অসম্ভবকে করেছেন সম্ভব। ম্যাসিনী, গ্যারিবল্ডি, কাভুর, ওয়াসিংটন্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও স্বজাতির এমনই তুর্দ্দিনে—এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতের তুর্দ্দশা অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারতবাসী যখন নিরাশায় অবসন্ন তখন এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন—তাঁ'দের চিত্তরঞ্জন কর্‌তে।' চার শ' বছরেরও আগে বাংলার নিভৃতে শ্রীচৈতন্যদেব যেমন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

তাঁ'র মৃদঙ্গ ও করতাল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মধুর হ'তেও মধুর হরিনামের বন্যায় অজয়ের তটপ্রান্ত হ'তে মণিপুরের বনান্তরাল অবধি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনই বাংলার রাজনৈতিক মরা-গাঙ্গে প্রেমের মহিমার বন্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে ভাসিয়ে

দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের স্বরূপ দেখে বাঙ্গালী ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্ভ্রমভরে এবং নতমস্তকে সেই ত্যাগী, সেই প্রেমিক, সেই মহানুভব মহাত্মা চিত্তরঞ্জনকে অঞ্জলি ভরে অর্ঘ্য দিয়েছিল। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কবি তাঁ'র মৃত্যুতে শোক ক'রে গেয়েছিলেন—

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।"

চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কল্‌কাতায় ভূমিষ্ঠ হন। তাঁ'র পৈতৃক নিবাস ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। সততা ও উদারতার জন্য তাঁ'দের বংশের খ্যাতি চির-বিশ্রুত ছিল। পিতা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন এটর্ণী।

১৮৯৩ সালে চিত্তরঞ্জন কল্‌কাতায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তাঁ'র পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয়ের দানের ছিল না শেষ। যথেষ্ট উপার্জ্জন কর্‌লেও দানের জন্যই তাঁ'র অনেক ঋণ হয়। ঋণ এত বেশী হয় যে তিনি শেষে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হন। তা'রপর তাঁ'র তিরোভাব ঘটে; পিতার ঋণ শোধ কর্‌তে পুত্র চিত্তরঞ্জন হ'য়ে পড়্‌লেন ব্যস্ত। দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখালে পাওনা-দারদের টাকা না দিলেও চলে। ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৭০০০৲ টাকা। বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব ঋণের পরিমাণ ও ঐ সমস্ত পরিশোধের জন্য চিত্তরঞ্জনের আগ্রহ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিলেন, "দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়ে ঋণ শোধ করে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আমি আর শুনি-নি।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন ক'রেই চিত্তরঞ্জনের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মামলায়

তিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেননি। দেশবাসী তাঁ'র ত্যাগ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে নানাভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। চারদিকে তাঁ'র ডাক্ পড়্‌তে লাগ্‌ল। বড় বড় মামলায় ব্যারিষ্টাররূপে তিনিই নির্ব্বাচিত হ'তে লাগ্‌লেন। হাজার টাকার কম কোন পক্ষের ব্যারিষ্টাররূপে দাঁড়াতেন না কল্‌কাতায়—মফস্বলে তিনি আরও বেশী নিতেন। চিত্তরঞ্জন পিতার ন্যায়ই দাতা ছিলেন। ব্যারিষ্টারী ক'রে অজস্র অর্থ আস্‌তে লাগ্‌ল বটে কিন্তু সঞ্চয় কর্‌বার মত লোক তিনি ছিলেন না। কত দরিদ্র ও অনাথা বিধবা, দরিদ্র গ্রন্থকার, কন্যাদায়গ্রস্তকে যে তিনি সাহায্য করেছেন তা'র ইয়ত্তা নেই। ঐ সময়ে তাঁ'র মত জনপ্রিয় ব্যারিষ্টার খুব কমই ছিলেন। লোককে জানিয়ে তিনি দান কর্‌তেন না। ময়মনসিংহের এক মোকদ্দমায় তিনি গেলে, সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে বল্‌লেন, "ছেলের উপনয়ন হ'চ্ছে না টাকার অভাবে।" চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কত টাকার দরকার ?" তিনি বল্‌লেন, "পাঁচ শ' টাকা"। দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎ ঐ টাকার একখানি চেক্ দিয়ে দিলেন।

তাঁ'র দানের কথা গল্পের মত। ডাক্তারকে খামের মধ্যে বহু টাকার চেক্ দান, ২৫,০০০৲ টাকা দিয়ে ভদ্রলোকের পৈতৃক বাসভূমি রক্ষা, কাউকে মাসিক ১৫০৲, কাউকে ৭৫৲, কাউকে ২৫০৲, কাউকে ৫০০৲—এমন কত যে তাঁ'র নিয়মিত দান ছিল তা'র ঠিক ঠিকানা নেই। নবযুগের বিজয়বাবু লিখেছেন, "১৯১১ কি ১২ সাল প্রাতঃকাল, সম্ভবতঃ শনিবার, একঘর লোক, চুরটের ধোঁয়ায়, হাস্য কলরবে সর গরম, এই সময়ে ছিন্ন জীর্ণ বসন পরিহিত এক কৃশকায়

বালক নগ্নপদে অতি সন্তর্পনে কক্ষ অন্তরাল দিয়া ঢুকিল। চিত্তরঞ্জনের প্রফুল্ল উজ্জ্বল দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেইদিকে পাড়ল। চিত্তরঞ্জন ডাকিলেন 'কি হে ছোকরা? এদিকে এস।' বালকের পিছনে, দরজার আড়ালে আসিয়া যে একখানি শীর্ণকায়া বিধবার হস্ত বালককে ধরিয়াছিল তা' দেখা গেল। চিত্তরঞ্জনের ডাকে সে সেই হাত ছাড়াইয়া অতি ভয়ে ভয়ে কম্পিত পদে অগ্রসর হইল। চিত্তরঞ্জন আবার অতি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাও বল?' তবু বালক ভয়ে কথা কহিতে পারিতেছিল না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁপিতেছিল। দেশবন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভয় কি বল?' এবার বালক ধীরে ধীরে বলিল, 'আমার মা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার বোনের বিয়ে' এটুকু বলিয়াই সে আর বলিতে পারিল না, তিনি শেষ পর্য্যন্ত আর শুনিতেও চাহিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন কত টাকার জন্য আট্‌কেছে বল? বালক ভয়ে ভয়ে বলিল 'একশ টাকা' চিত্তরঞ্জন এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া, ভাঁজ করিয়া, একজনকে ডাকিয়া সেটি দিলেন। বালককে বলিলেন, 'ওর সঙ্গে যাও।' ঘরে যাঁরা বসিয়া ছিলেন সকলেই ভাবিতে লাগিলেন কত দিলেন, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, সকলেই চুপ্‌চাপ্‌। একটু পরে একজন ব্যারিষ্টার সবে একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এম্নি সময়ে সেই বালকটি একখানি একশ টাকার নোট্‌ হাতে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে গেল 'মা বল্লেন'—চিত্তরঞ্জন স্নেহমধুরস্বরে উত্তর দিলেন, 'হয়েছে, হয়েছে, তোমার বোনের বিয়ে হ'য়ে গেলে আমাকে বলে যেও, এখন এস।' তাঁ'র কাছে সৎকারের জন্য সাহায্য চাইলে কেউ কখনও বিমুখ হন্‌ নি।"

ভবানীপুর অনাথ আশ্রম, ১৯১৯ সালের দুর্ভিক্ষে ১০,০০০৲ টাকা, চাঁদপুরের কুলীদের জন্য, ভুবনমোহন হলের জন্য, নিজগ্রামে বিদ্যালয়, পুকুর প্রভৃতির জন্য তাঁ'র অজস্র অর্থ দান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঐগুলি ছাড়াও সাহিত্য সম্মিলনীতে, সমাজপতির ও স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের ঋণ শোধ করে দেওয়া, রসা রোডের বাড়ী, কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ব্যাঙ্কের হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও হাওলাত ক'রে ২৭,২৫০৲ টাকা দেওয়া—এই সকল দান স্মরণ কর্‌লে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে হৃদয় একান্ত অভিভূত হ'য়ে পড়ে। দান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি বল্‌তেন, "দেখ আমি যখন দান করি তখন এ কথা আমার মনেও হয় না যে আমি অন্য কাউকে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, এ যেন আমি নিজের কাছেই নিজে টাকা রাখ্‌ছি। ভগবান্ যেন আমার ভিতর দিয়ে এই দান করিয়ে নিচ্ছেন।" দেশবন্ধুর কাছে সত্যি সত্যি আত্ম-পর ভেদ জ্ঞান ছিল না, তা'ই তিনি এমনভাবে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন।

অশুভ ১৯২৫ সালের ১৫ই জুন এল। হঠাৎ তাঁ'র সামান্য জ্বর হ'ল। তিনি তখন দার্জ্জিলিংয়ে; পরদিন ১১টার সময় অবস্থা সঙ্কট-জনক হ'য়ে উঠ্‌ল। ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৫টার সময় সারা বাংলায় ক্রন্দন-রোল তুলে দার্জ্জিলিংয়ের ষ্টেপ্ এসাইড্ গৃহে তাঁ'র তিরো-ভাব ঘট্‌ল। রইলেন তাঁ'র প্রিয়তমা পত্নী বাসন্তী দেবী, একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন, দু'কন্যা অপর্ণা ও কল্যাণী দেবী, একমাত্র ভ্রাতা পাটনা হাইকোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (Mr. P. R. Das)। শেষে পুত্র চিররঞ্জনও তাঁ'র কাছে চলে গেছে।

(৮) রায় বাহাদুর **চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

১৮৮২ সালের ১৮ই নভেম্বর প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্‌টার অফ্ স্কুল্‌স স্বর্গীয় রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই মহোদয়ের পুত্ররূপে, রায় চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও, বি, ই বাহাদুরের জন্ম হয়।

পিতা নিজে সুশিক্ষিত ও শিক্ষাব্রতী সুতরাং পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তাঁ'র ব্যগ্রতা অতি স্বাভাবিক। পুত্র পাঁচ বৎসরে পদার্পণ কর্‌তে না কর্‌তেই তাঁ'কে তিনি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করালেন। বালক অসাধারণ মেধা বলে প্রতি বৎসর উত্তীর্ণ হ'য়ে অবশেষে কল্‌কাতার হিন্দু স্কুল হ'তে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁ'র আশৈশব অসামান্য ব্যুৎপত্তি দেখা গিয়েছিল। এজন্য তাঁ'র শিক্ষকগণ ও সমপাঠীবৃন্দ তাঁ'র নিয়ত প্রশংসা কর্‌তেন।

ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি এম্, এ ও ল পড়্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় তাঁ'র পিতৃদেবের চেষ্টায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ কর্‌লেন। তখন তাঁ'র বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। এত অল্প বয়সে কেউ এ পদ পায় নি।

আশৈশব তিনি শুধু বিদ্যার্জ্জনে ব্যাপৃত না থেকে স্বাস্থ্যের দিকেও সবিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। নানাবিধ স্বাস্থ্যজনক শারীরিক ব্যায়াম, ফুট্‌বল, ক্রিকেট. টেনিস্, হকি প্রভৃতি ক্রীড়ায় তাঁ'র আগ্রহের অবধি ছিল না। মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখ্‌বার জন্য প্রতিনিয়ত তিনি চেষ্টা কর্‌তেন। গুরুদায়িত্বপূর্ণ

রাজকার্য্যেও অনলসভাবে পরিশ্রম ক'রে—সর্ব্বদা ধর্ম্মাধর্ম্মে দৃষ্টি রেখে—ন্যায়পথে, নিরপেক্ষভাবে আদর্শ বিচারক ব'লে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করতে লাগলেন। অনেক বড় বড় জটিল মোকদ্দমায় তাঁ'র ন্যায়-বিচার ও সূক্ষ্ম-দর্শিতার প্রমাণ জাজ্বল্যমান্ হ'য়ে উঠ্ল। বাদী প্রতি-বাদীদের অত্যাচার, অনাচার তিনি কদাচ সহ্য করতেন না। অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ব'লে অনেক সময় তাঁ'র উন্নতির
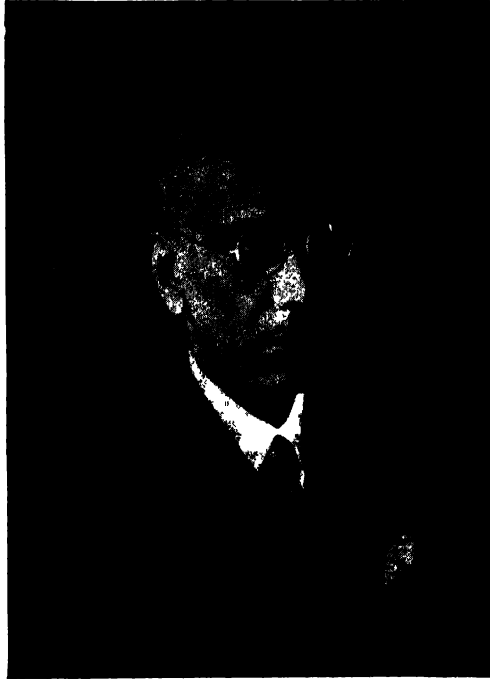
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অন্তরায় হয়েছে। তিনি সে সকলে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি। এই রকমের নির্ভীকতা ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তাঁ'র অধীন ও সহকর্ম্মিগণ তাঁ'কে চিরকাল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি অপরাধীর পদ, জাতি বা ধনগৌরব বিবেচনা ক'রে বিচার করতেন না। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী, নির্ধন যে কেউ হ'ক্ না

কেন, অপরাধ প্রমাণিত হ'লে তা'র উপযুক্ত শাস্তিবিধানে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করেন নি।

প্রায় নয় বছর বাংলা-দেশে ন্যায় বিচার পরিচালনা ক'রে, অশেষ যশোভাজন হ'য়ে তিনি বিহার প্রদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্‌টার ও অবশেষে ডিভিসনাল্ কমিশনার পদে উন্নীত হন। তাঁ'র মত অত অল্প বয়সে আজ পর্য্যন্ত অন্য কেউ ডিভিসনাল্ অফিসার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্, সেক্রেটারী বোর্ড অফ্ রেভিনিউ হ'তে পারেন নি। একমাত্র তিনিই বিহার প্রদেশের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হ'তে কমিশনার পদ লাভে সমর্থ হয়েছেন।

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল অশেষ প্রশংসা ও অনন্য-সাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য পরিচালনা ক'রে বিগত ১৯৩৭ সালে ১লা মার্চ্চ তারিখে তিনি বিহারের ভাগলপুরের বিভাগীয় কমিশনারী করতে করতেই অবসর গ্রহণ করেছেন। গভর্ণমেণ্ট্ তাঁ'র অসামান্য কৃতিত্ব ও বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁ'কে যুগপৎ রায় বাহাদুর এবং ও, বি, ই উপাধি-ভূষণে অলঙ্কৃত করেছেন।

(৯) হাজি মোহম্মদ মোহসেন

ইংরেজী ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে হাজি ফয়জুল্লা নামক একজন মহা গুণবান্ ও রূপবান্ ইস্পাহানী মোসলমানের পুত্ররূপে হাজি মোহম্মদ মোহসেনের জন্ম হয়। আগা মোতাহার নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইস্পাহানী ধনী হাজি ফয়জুল্লা সাহেবের মাতুল ছিলেন। তাঁ'র এক মেয়ে হয়, তাঁ'র নাম ছিল মন্নু্জান। মন্নু্জান খানমের বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাঁ'র পিতার

মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর সময়ে পিতার সমস্ত সম্পত্তি পিতা তাঁ'কে দিয়ে যান। তাঁ'র মায়ের সঙ্গে হাজি ফয়জুল্লার বিয়ে হয়। এই বিয়ের শুভফল হ'চ্ছে হাজি মোহম্মদ মোহসেন। মামাতো ভগ্নী হ'লেও মন্নুজান খানম মোহম্মদ মোহসেনকে অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন। দু'জনে একত্র আগা সিরাজি নামে একই শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ছোটবেলা থেকে মোহম্মদ মোহসেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন; হজ করতে মক্কা মদিনায় গিয়ে সেখান হ'তে ফিরে এসে তাঁ'র এই ভাব

হাজি মোহম্মদ মোহসেন

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে আগা মোতাহার সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জ্জা সালেহ্-উদ্দীনের সঙ্গে মন্নুজানের বিয়ে হয়। সালেহ্-উদ্দীন হুগলীর ফৌজদার, পারস্য ভাষায় মহাপণ্ডিত ও সুকবি এবং অত্যন্ত ধনী ছিলেন। ১৭৫৪ সালে সালেহ্-উদ্দিনের মৃত্যু হয়। ভগিনী মন্নুজান বিধবা হ'য়ে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিনী হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নুজানের মৃত্যু হয় এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি মোহসেনকে দিয়ে

যান। ভগিনীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ত্যাগী পুরুষ মোহসেন এইবার মুক্তহস্তে দান করতে লাগলেন। তাঁ'র মত দানশীল লোক অতি বিরল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এক দানপত্র ক'রে তাঁ'র সমস্ত সম্পত্তি পরের মঙ্গলের জন্য দান করেন। নিজে কোরাণ লিখে বিক্রয় করতেন, নিজে জামা সেলাই ক'রে গায়ে দিতেন। কখনও কোন ভোগবিলাস তিনি করেন নি। তাঁ'রই অর্থে হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ অতিথিশালা ইমামবাড়া, হুগলীর কলেজ, শত শত স্কুল গড়ে উঠেছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র, জাষ্টিস্ আমির আলি, অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বঙ্গ-রত্নগণ তাঁ'রই কলেজের ছাত্র। পরোপকারের জন্যই এই মহামানবের জন্ম হয়েছিল। রাত্রে গোপনে কত যে দরিদ্রের ঘরে তিনি সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তা'র ইয়ত্তা নাই।

(১০) লর্ড **সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ**

বাঙ্গালীর মুকুটমণি হ'চ্ছেন এই লর্ড সিংহ। বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ সালের ২৪শে মার্চ্চ এঁর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আইন পড়তে যান ইংল্যাণ্ডে। সেখানে কৃতিত্বের জন্য ৫৫০ গিনি পারিতোষিক তিনি পান। ১৮৬৫ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি কল্‌কাতা হাইকোর্টে ব্যারেষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্‌সেল্ ও দু' বছর পরে হন এড্‌ভোকেট্ জেনারেল। পরে তিনিই (প্রথম ভারতবাসী) ভারত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির ব্যবস্থা সচিব [Law Minister, Viceroy's Council] হন। ইং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় বিলাতের সামরিক মন্ত্রণা-সভায়

তিনি একজন সদস্য হন। প্রথম ভারতবাসী হিসাবে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহই আণ্ডার সেক্রেটারী টু দি ষ্টেট্স অব ইণ্ডিয়া পদ প্রাপ্ত হন।
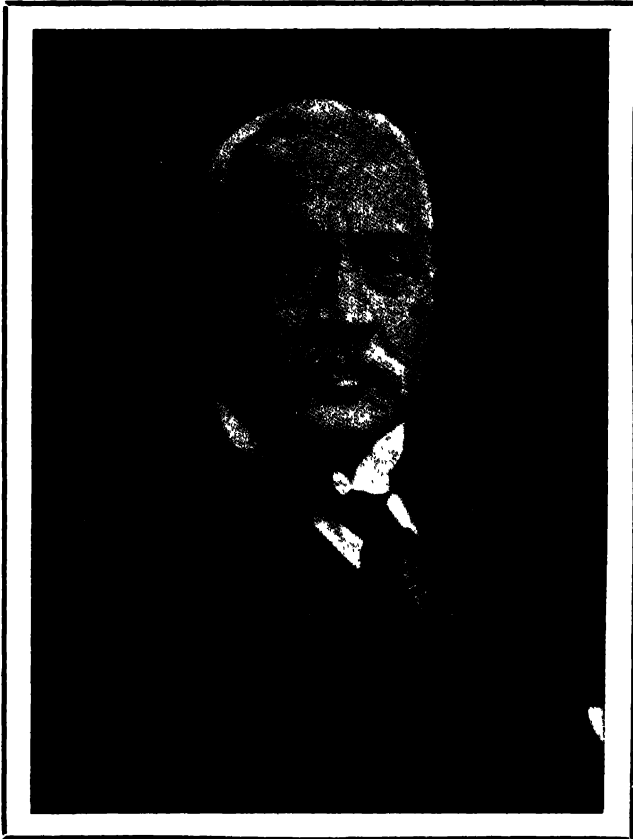
লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

ইং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ভারত সরকারের প্রতিনিধি হ'য়ে যান। এর পর তিনি লর্ড উপাধিতে

ভূষিত হন এবং সহকারী ভারত সচিবরূপে পার্লামেণ্ট মহাসভা
আসন গ্রহণ করেন। প্রথম বাঙ্গালী লর্ড হ'চ্ছেন এই লর্ড সিংহ
মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পর তিনি বিহা
ও উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হন। বাঙ্গালী ও ভারতীয় হিসা
তিনিই প্রথম গভর্ণর হন। এক বৎসর পরে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া
তিনি ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে নাইট ও ভারতীয় মহাসভা
কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

= শেষ =